হরিপুরা থেকে রামগড়

নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮০

প্রচ্ছদ
প্রভাত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
সুভাষ ভদ্র
২৪/১, গ্রীক্ রো
কলিকাতা-৭০০০১৪

মুদ্রক
প্রত্যয়
২৪/১, গ্রীক রো
কলিকাতা-৭০০০১৪।

পরিবেশক
উচ্চারণ
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯।

দাদাকে

।। নিবেদন ।।

আশ্চর্য্যের কথা, এই অকিঞ্চিৎকর বইটা লেখা এবং ছাপানোর সময়ে বহুজনের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। তাঁদের সকলের প্রতি অন্তরতম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। লেখার ব্যাপারে অনেক বইয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে, রচয়িতাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ—যদিও ভুল-ভ্রান্তির সার্বিক দায়িত্ব এককভাবে আমারই।

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, জাতীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার (গোলপার্ক) এবং নিউ আলিপুর কলেজ গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী হয়ে রইলাম।

চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ এড়িয়ে যাওয়া যায় নি। দেখতে পাচ্ছি—'লক্ষণীয়', 'শ্রদ্ধাঞ্জলি,' 'আম্বেদকর' প্রভৃতি অনেক শব্দের ক্ষেত্রেই মাঝে মাঝে বিভ্রান্তি ঘটে গিয়েছে। কখনো কখনো ঘটেছে চন্দ্রবিন্দুর অকারণ আবির্ভাব। দৈনন্দিন বিদ্যুৎ-বিপর্যায়ের মধ্যে মুদ্রাকরের পক্ষে এর চাইতে ভালভাবে কাজ করা সম্ভব ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস। তবু আশা করব, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সব ত্রুটি বিচ্যুতিকে ক্ষমার চোখে দেখতে পারবেন ॥

—নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত।

॥ ভূমিকা ॥

হরিপুরা-কংগ্রেস দিয়েই শুরুটা হওয়া উচিত ছিল। অন্তত, তাতে বই-এর নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকত। কিন্তু হরিপুরা-কংগ্রেসের পটভূমিটা পরিষ্কার করে দেখাতে গিয়ে প্রথম পর্ব লিখতে হল। হরিপুরা এবং তার পরবর্তীকালের কথা এসেছে দ্বিতীয় পর্বে।

একথা বলা চলে যে, হরিপুরাতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক অভিষেক ঘটেছিল। কিন্তু রাজনীতির অমোঘ নিয়মেই তাঁর উচ্চ-স্থান-অবস্থিতি দীর্ঘকালীন হয় নি। অনতিকাল পরেই তাঁকে সরে আসতে হয়েছে আর শেষ পর্য্যন্ত তাঁর স্থান হয়েছে পঙক্তির বাইরে। নির্বাসন-দণ্ড নিয়ে তিনি নতুন পথের সন্ধান করেছেন। এতে কবি-গুরুর আশির্বাদ মিললেও রাজনীতি-আসরের কর্ত্তাব্যক্তিদের বিরূপ-তার অবসান ঘটে নি আদৌ।

অতঃপর প্রশ্ন উঠবে—কেনই বা এই সসম্মান অভিষেক আর কেনই বা এই নিষ্ঠুর নির্বাসন? এই দুই বিপরীত ক্রিয়ার মধ্যে যুক্তির অভাব আছে বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু দুটো ব্যাপারই একটা নিছক রাজনৈতিক ছকের অঙ্গ। এই ব্যাপারে কিন্তু ভাসা-ভাসা ধারণা প্রচলিত ছিল বলেই দরকার সমস্ত ব্যাপারটার একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ।

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা বিশেষ সুরে গান্ধীজীর আবির্ভাব নিশ্চয়ই একটা যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি যেমন জাতির ঘুম ভাঙিয়েছেন, তেমনি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী-প্রভাবিত কংগ্রেস-আন্দোলনকে পৌঁছে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে। আবেদন-নিবেদনের নিষ্ফল রাজনীতিতে তিনি এনেছেন অসহযোগ আর সত্যা-গ্রহের সঞ্জীবনী মন্ত্র।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, তাঁর রাজনীতিতে বলিষ্ঠ-তার বড় অভাব। তাঁর নেতৃত্বে গতিশীলতার স্থান নেই কোনো।

তিনি আন্দোলন শুরু করেই আপোষের পথ খুঁজেছেন শুধু। স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামের চাইতে তাঁর কাছে বড় কথা হল চাপ সৃষ্টি করে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নেওয়া। এই ব্যবসায়ী রাজনীতিতে তরুণ সুভাষের আস্থা ছিল না কোনোদিনই। আরো বড় বিপদ দেখা দিল গান্ধীজীর দ্বৈত-ভূমিকার জন্য। তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি বিশ্বপ্রেমিক দার্শনিক। অহিংসাই তাঁর মহামন্ত্র। তিনি শত্রুরও হৃদয় জয় করতে চেয়েছেন, ভালবাসতে চেয়েছেন বলদর্পী শোষক ইংরেজকেও। তাঁর কাছে লক্ষ্যটাই বড় কথা নয়, সমান গুরুত্বপূর্ণ পথটাও। সেইজন্যই স্বাধীনতার চাইতেও তাঁর কাছে বড় হল অহিংসা, রাজনৈতিক স্বাধিকারের চাইতে বড় আত্মিক মুক্তি।

সব চাইতে লক্ষণীয় বিষয় হল, গান্ধীজী তাঁর পথ সম্বন্ধে পূর্বপরিকল্পনা নেন নি। তাঁর পক্ষে একটা পদক্ষেপই যথেষ্ট—এই দর্শন নিয়েই তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কতগুলো বিকল্প ছক নেতাকে তৈরী রাখতে হয়, ইতিহাস-চেতনার সাহায্যে পূর্ব-সিদ্ধান্ত নিতে হয়, পরিস্থিতি-অনুসারে বদলাতে হয় আন্দোলনের ধারা, সংগ্রামের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে একটা যুক্তিগ্রাহ্য সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয়—এসব তিনি মানেন নি। কারণ ইতিমধ্যেই তিনি অবতারের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। তিনি চলেছেন অন্তরের আলোয়, ঈশ্বর তাঁকে নির্দেশ দিলে তবেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর শিষ্যরা দাবী করেছেন—যুক্তিবাদ তাঁর জন্য নয়, যুক্তি দিয়ে তাঁর বিচারও চলে না—তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত এক দুর্জ্ঞেয় মহাপুরুষ।

এই ধরণের ব্যক্তি ধর্মীয় জগতে স্থান দিলে অসুবিধে হয় না, কিন্তু একটা মুমুক্ষু জাতির মুক্তি-পথের নেতৃত্ব দিলেই বিড়ম্বনা ঘটে। সেইজন্যই তাঁর আবির্ভাবের পর কংগ্রেস-সংগঠন থেকে যুক্তিবাদ বিদায় নিল। অন্ধভক্তেরা শিখলেন তাঁর নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে। যাঁরা ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত, তাঁরা কিছুক্ষণ মানসিক দোলায় দুলে শেষ পর্য্যন্ত সশ্রদ্ধায় শুনলেন সেই দৈববাণী।

প্রতিবাদ যে অবশ্য আদৌ হয় নি তা নয়। কিন্তু গান্ধীজীর শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বী দেশবন্ধু বেশীদিন তাঁর বিজয়ের ঝঞ্ঝাবাত রুখতে

পারেন নি বিধির বিধানের ফলে। বাধা দিতে পারতেন তিলক, কিন্তু তিনিও বিদায় নিয়েছেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মতিলাল ও লাজপৎ রায়ও দুর্বল হয়ে গিয়েছেন, উভয়েরই মৃত্যু ঘটেছে অল্প কালের মধ্যে। জিন্না এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কংগ্রেস ছেড়েছেন। গান্ধীজীর সমালোচনা করায় ন্যরীম্যানকে সরে যেতে হয়েছে রাজনীতির নেপথ্যে।

অথচ এরই মধ্যে সুভাষচন্দ্র রুখে দাঁড়িয়েছেন এই ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের ভেতর যেমন তিনি আনতে চেয়েছেন যুক্তিবাদ, তেমনি একে পরিণত করতে চেয়েছেন একটা সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে। তাঁর মনে হয়েছিল, গান্ধীজী দেশের ক্ষাত্রশক্তিকে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর। এই নেতিবাচক, শান্তিকামী রাজনীতি স্বাধীনতা-সংগ্রামকে শুধু পিছিয়ে দিয়েছে বলেই তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল। তিনিও একথাও বুঝেছিলেন যে, গান্ধীজীর কাছে দেশের মুক্তির চাইতেও বড় হয়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

গান্ধীজীর শ্রেণী-সমন্বয়ে বিশ্বাস তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণপন্থায় নিয়ে গিয়েছে। জমিদার-পুঁজিপতিরা তাকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। তাঁর 'অছিবাদ' যেমন জমিদারদের অভয় দিয়েছে, তেমনি ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যিক স্বার্থে চেয়েছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যা তাঁর আন্দোলনের ধারারই একটা অঙ্গ। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বলেই জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, রাশিয়ার অনুকরণে শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের সঙ্কট-মোচন করতে চেয়েছেন। তাঁর কল্পিত সমাজে শিল্পের হবে জাতীয়করণ, কৃষিতে ঘটবে যান্ত্রিক বিপ্লব, দরিদ্রদের প্রয়োজনে ধনিক-স্বার্থে আঘাত আসবে, অবসান ঘটবে শোষণের। তিনি গান্ধীজীর মতো চরকা-খাদি-গ্রামোন্নয়নের স্বপ্নে বিভোর থাকতে পারেন নি। তিনি আধুনিকতার পূজারী। তাঁর মতে, পৃথিবীর সব দেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে—রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতিতে প্রয়োজন হবে সাম্প্রতিকতম জ্ঞান, আধুনিক গবেষণার নব-রূপায়ণ।

সুতরাং গান্ধীজীকে নিয়ে এক সঙ্গে পথ চলা সম্ভব নয়।

কিন্তু গান্ধীজী আশা ছাড়েন নি। তিনি জানতেন, দেশ তাঁর

জন্য চিরদিন এভাবে অপেক্ষা করবে না। সেদিন তাঁর নেতৃত্ব নিয়েই টান পড়বে।

সেই জন্যই তিনি নবীন ভারতের দুই প্রতিনিধি—জবাহরলাল ও সুভাষকে টেনে নিতে চাইলেন। আদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও চির-অস্থির জবাহরলাল গান্ধীজীর সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে বাঁধা পড়লেন শেষ পর্য্যন্ত।

বাকী ছিলেন সুভাষ।

তাই ১৯৩৮ সালে তাঁকে হরিপুরায় কংগ্রেস-সভাপতি করা হল।

কিন্তু গান্ধীজীর হিসেবে এবারেই গণ্ডগোল হল যেন। কৃতজ্ঞতায় সুভাষ গললেন না, সম্মান পারল না তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে। বরং আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নেওয়ার জন্য তিনি এক আপোষহীন, মরণ-পণ লড়াইতে ডাকলেন দেশবাসীকে। গান্ধীজীর অর্থনৈতিক তত্ত্বকে তছনছ করে দিয়ে গড়লেন প্ল্যানিং-কমিটি। ইংরেজের সঙ্গে ফেডারেশন নিয়ে যে আপোষের আশা ছিল, তাঁর নীতি সেই ব্যাপারেও বাধা হয়ে উঠল।

সুতরাং আর নয়।

তবু সুভাষ গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত করেই দ্বিতীয়বার বিজয়ী হলেন। কিন্তু গান্ধীজী তখন কংগ্রেস-সদস্য না হলেও তিনি ব্যক্তি-কংগ্রেস। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের ধৃষ্টতা ক্ষমা করা হল না।

সুভাষ কংগ্রেসের মধ্যেই নতুন দল গড়লেন। কিন্তু পথ আলাদা হয়ে গেল, রামগড়ে বসল দুই পৃথক শিবির।

বিপরীত প্রান্ত থেকে তাঁরা এসে হরিপুরায় মিলিত হয়েছিলেন। রামগড় থেকে কিন্তু চির-বিচ্ছেদ হয়ে গেল আবার।

সেই মিলন আর বিরোধ নিয়েই এই কাহিনী॥

।। প্রথম পর্ব ।।

॥ এক ॥

হরিপুরা থেকে রামগড়।

কতটুকুই বা পথ? ভৌগলিক দিক থেকে দেখলে দূরত্বটা কিছুই নয়।

কিন্তু, ইতিহাসের দিক থেকে? যদি স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই সীমিত কালটাকে দেখা যায় নির্মোহ দৃষ্টিতে, তাহলে মনে হবে এ এক অন্তহীন পথ-পরিক্রমা। সেই ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা এক আত্ম-নিবেদিত দেশনায়কের দীর্ঘশ্বাস আর অন্যদিকে সেদিনের প্রধান দেশনেতাদের কদর্য্য ঈর্ষ্যা, দলাদলি, ক্ষমতালোভ আর কুটিলতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। একালের অভিমন্যুকে হতমান আর নিষ্ক্রিয় করার জন্য যে-ভাবে রথী-মহারথীরা নির্লজ্জ চক্রব্যূহে মিলিত হয়েছিলেন, তার নজীর কোনো দেশের কোনো কালের ইতিহাসে আছে কিনা জানি না।

১৯৩৮ সালের রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীচক্র তার নির্মম রূপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। নির্বাচনে সুভাষ জয়লাভ না করলে কি হত কে জানে, কিন্তু গান্ধীজী আর গান্ধীচক্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও নবজাগ্রত তারুণ্যের প্রতীকরূপে সুভাষচন্দ্রের কপালেই অঙ্কিত হল গৌরবের বিজয়-টীকা। সেই থেকে গান্ধীজী ও তাঁর অনুচররা হিংস্র আক্রোশে সুভাষকে উৎখাত করার জন্য সমবেত হলেন। কারণটা আমরা আলোচনা করব যথাসময়ে। কিন্তু দেখতে হবে এঁরা কারা? এঁরা সবাই কি গান্ধীবাদী? এঁরা কি রাষ্ট্রদর্শনে বা চিন্তাধারায় একই

শিবিরের অন্তর্ভুক্ত ?

একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, রাষ্ট্রদর্শন, কর্মপন্থা বা চিন্তাধারায় এঁদের পার্থক্য সুস্পষ্ট, পারস্পরিক সম্পর্কে রয়েছে জটিল দ্বন্দ্ব, ঈর্ষ্যা আর সন্দেহ। অথচ এঁরা অন্ধ সুভাষ-বিদ্বেষে আর ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছেন সাময়িকভাবে। এভাবেই মিলিত হয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক নেহরু, রক্ষণশীল রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর ধনিক-প্রতিভূ প্যাটেল।[১] পেছনে ছিলেন অন্যান্যরা। উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা আর গান্ধীর বেতনভুক কর্মীদল। কূট ইংরেজ আর তার প্রতিনিধিরা তো ছিলই।

এই নেতাদের চোখে সুভাষ এক দাম্ভিক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা যিনি নিজস্ব হটকারিতায় গান্ধীর জীবনব্যাপী সাধনাকে ব্যর্থ করে দিতে চান। আরো অনেকের কাছেই সুভাষচন্দ্র নিছক ক্ষমতালোভী এক ব্যক্তি।[২] এটা ঠিক যে, সুভাষ বারবার গান্ধী-নেতৃত্বের বিরূপ সমালোচনা করেছেন, কখনো কখনো বিকল্প নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। কিন্তু তিনি যদি ক্ষমতালোভী হতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল গান্ধীজীর অনুসারী হওয়া, কারণ সুভাষও জানতেন সেদিন গান্ধীর বিরোধিতার অর্থই ছিল রাজনীতি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া।[৩] হরিপুরায় রাষ্ট্রপতি-পদের দুর্লভ সুযোগ যখন তাঁর কপালে জুটেছিল; গান্ধীর পেছনে থাকলে নিশ্চিন্ত-নিরুপদ্রব জীবনে আরো কত সম্মান ও সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যেত, পরবর্তীকালের মন্ত্রীসভায় একটা উচ্চাসন-লাভও দুরূহ হত না।

অথচ তিনি কঠিন সংগ্রামের পথই বেছে নিলেন—যদিও জানতেন এই পথ দুর্গম, অনিশ্চিত, শঙ্কাপূর্ণ, এই পথে সঙ্গীরা হয়ত পিছিয়ে যাবে, একক অভিযানে হয়ত পদে পদে হতাশা আর পরাজয় এসে গ্রাস করবে। তবু সেই অনিশ্চিত, বন্ধুর পথেই তিনি পা বাড়িয়েছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে আপোষ করলে ব্যক্তি-জীবনে তাঁর অনেক সুবিধে হত, কিন্তু নিজের সুবিধের জন্য তিনি কখনো তাঁর

আদর্শত্যাগ করেননি।[৪] যতদিন পেরেছেন, তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে চলেছেন, তারপর এক সময় পথ ভিন্ন হয়ে গেল। আপোষের ঘৃণ্য পথ ছেড়ে তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের সন্ধানে ছুটেছেন অস্থির প্রাণ-চাঞ্চল্যে। লাভ-ক্ষতি-টানাটানির হিসেবী পথে চলা চরিত্রে নেই, পাওনা-গণ্ডার দর-কষাকষির রাজনীতিতে তার আশৈশব ঘৃণা। লক্ষ্য যখন ঠিক হয়ে যায়, তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে চান কর্মস্রোতে, লাভ-লোকসানের হিসেব না করেই দুনিবার আকর্ষণে তিনি তো কবেই ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছেন, অনিশ্চিত-অজানা বারবার ডেকেছে তাঁকে।[৫]

এই বিপজ্জনক পথে সব কিছু ছেড়েই যেতে হয়। লক্ষ্যটা বড় বলেই ত্যাগ-স্বীকারটাও বিপুল হতে বাধ্য। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯-৩১ সালে সুভাষ বন্ধুকে লিখেছিলেন—যদি হাস্যোজ্জ্বল সকালের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে চাও, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে প্রতীক্ষা করতে হবে, প্রস্ফুটিত গোলাপের জন্য সহ্য করতে হবে কণ্টকের যন্ত্রণাকে। তেমনি দাম দিতে হবে স্বাধীনতার জন্যও—'Do you want the joy of liberty and the sobre of freedom? If so, you must pay the price. And the price of liberty is suffering and sacrifice

আসলে, সুভাষচন্দ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহে পথে নামেন নি, এক নিরাসক্ত দার্শনিক-মন তাঁকে সংসার থেকে বের করে এনেছে। পাওয়ার ভাবনা না ভেবেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন ভারতপথিক। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর কাছে পবিত্র, ভারতবর্ষ তাঁর চির-আরাধ্যা জননী। তাই যে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখে প্রথম দর্শনেই তিনি এক মোহমুক্ত দার্শনিক।[৬]

ইংরেজী শব্দ 'Patriotism' দিয়ে সুভাষের দেশপ্রেমকে বোঝা যাবে না, য়ুরোপীয় অর্থেও তিনি নেতা নন। তাঁর সমগ্র জীবন-সাধনার পেছনে তাঁর মৌল দার্শনিক বোধকে আগে বুঝতে হবে।[৭]

তিনি লিখেছেন, রাজনীতি তাঁর সাময়িক বৃত্তি নয়, দেশ তাঁর চোখে কোনো ভৌগলিক সত্তাও নয়। তিনি লিখেছেন: নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারত-মাতার পদাম্বুজে অঞ্জলি-স্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আন্তরিক উৎসর্গের মধ্য দিয়া পূর্ণ-তর জীবনলাভ করিব—এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়া-ছিলাম।[৮] তিনি আরো লিখেছেন: মহান আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি—কায়মন যদি সেই মহান আদর্শের সুরে বাঁধিয়া থাকি—আদর্শের সহিত যদি নিজের অস্তিত্ব মিশিয়া থাকে—তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট, আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও আমার (এবং বোধহয় ভাগ্যবিধাতার) কাছে ব্যর্থ নয়।[৯]

অবশ্য এই আত্মনিবেদনের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছে অনেক আগে। সেই উদ্যোগপর্বকে বাদ দিলে সুভাষকে বোঝা যাবে না কোনদিনই।

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে স্বাভাবিক ভাবেই আত্মজিজ্ঞাসা জাগল: জীবনের উদ্দেশ্য কি? লক্ষ্য কি এই অস্তিত্বের?

অশান্ত সুভাষ অহনির্শ উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন। তিনি পর-বর্তীকালে স্বীকার করেছেন যে, এই সময় তিনি এক বিচিত্র মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছিলেন। বারবার মনে হয়েছে, জীবন কি শুধু ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য? অস্তিত্ব কি শুধু পার্থিব সাফল্যের স্মারক হয়ে থাকার জন্যই?

এই সময়েই হাতে এল বিবেকানন্দের রচনা। সহসা সমস্ত দেহে মনে এক অপার্থিব রোমাঞ্চ লাগল। জানলেন—সেবার মধ্য দিয়েই মুক্তি আসে, আর সব মুক্তির চেয়ে বড় দেশজননীর মুক্তি। জানলেন, জীবনের লক্ষ্য 'আত্মানাং মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'। এত-দিনে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের, সব জিজ্ঞাসার শেষ হল। তিনি লিখেছেন, আমি ব্যাকুল হয়ে খুঁজছিলাম একটা আদর্শ যার পেছনে আমি আমার

সমস্ত জীবনটাই উৎসর্গ করতে পাবব, যেখান থেকে কোনো অবস্থায় সরে আসার প্রশ্নই থাকবে না।[১০]

এই একাগ্র আদর্শনিষ্ঠা সম্বন্ধে নিজেই লিখেছেন : যদি জগতের ব্যবহারে আমার attitude পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ দুঃখ, নৈরাশ্য প্রভৃতি আনে, তাহা হইলে বুঝিব আমার দুর্বলতা। কিন্তু যে রকম আকাশের দিকে যার লক্ষ্য, সম্মুখে পর্বত আসছে কি কূপ আসছে তার যেমন জ্ঞান থাকে না। সেই রকম যার একমাত্র লক্ষ্য mission এর দিকে, আদর্শের দিকে, তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই।[১১]

বিবেকানন্দ তাঁর ইষ্টদেবতা বলে, তাঁরই আদর্শে সুভাষও একদিন গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছিলেন।[১২] ব্যর্থ হয়ে তাঁকে ফিরতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ততদিনে বিবেকানন্দের মতো তিনিও হয়েছেন প্রেমিক সন্ন্যেসী। এতদিনের অধরা ঈশ্বরকে তিনি দেশজননীর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন। সেইজন্য সুভাষের কাছে এই ভারতবর্ষই সেই চির-আরাধ্যা পরমেশ্বরী।

বিবেকানন্দের সেই বজ্রনির্ঘোষ—ভুলিও না জন্ম হইতেই তুমি মায়ের নিকট বলিপ্রদত্ত—সুভাষকে উন্মনা করে তোলে। নিজেকে সমর্পণ করার ব্যাকুলতায় সুভাষ অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি অনুভব করেছেন : যে ব্যক্তি কোনও মহান আদর্শকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার দরুণ দুঃখ পায়, তার কাছে দুঃখক্লেশ অর্থহীন নয়। দুঃখ তার কাছে আনন্দ বলে প্রতীয়মান হয় এবং সেই আনন্দ অমৃতের মত তার শিরায় শিরায় সঞ্চার করে দেয়। আদর্শের চরণে যে আত্মসমর্পণ করতে পারে, সে-ই কেবল জীবনের অর্থ বুঝতে পারে এবং জীবনের অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পেতে পারে।[১৩]

এই আদর্শবোধ থেকেই আসে আত্মত্যাগের মহৎ প্রেরণা। সুভাষ পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন যে, ওটেনকে আঘাত করেছিলেন অনঙ্গ দাস।[১৪] অথচ দুরপনেয় কলঙ্কের কালি মেখে, নিজের

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি কটকে ফিরে গিয়েছিলেন। যেতে যেতে ভেবেছিলেন—মহৎ আদর্শের জন্য অনেক সময় আত্ম-বলি দিতে হয়। এই ভেবে আনন্দ পেয়েছিলেন, তিনি এক চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, শত প্রলোভন আর উত্তেজনাতেও অন্যকে জড়িয়ে ফেলেন নি নেতৃত্বের দাম দিয়েছেন আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই।[১৫]

ইনসিন জেলে যখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, বৃটিশ সরকার সর্ত্ত-সাপেক্ষে সুভাষকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। সুভাষ তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্রকে লিখেছেন: আমি দোকানদার নই, দর কষাকষি আমি করি না। কূটচালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি। আমি একটা আদর্শ নিয়ে চলতে চেয়েছি। ব্যস, এখানেই শেষ। আমি জীবনকে এত প্রিয় মনে করি না যে, তাহা রক্ষার জন্য আমি চালাকির আশ্রয় লইব।[১৬]

সুভাষ সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুর পদসঞ্চার শুনেও মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন তাঁর শান্ত-সংযত প্রতিজ্ঞায়, তাঁর অকল্পিত বীর্য্যে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আত্মনিবেদিত। পূর্বপুরুষেরা দেশজননীর কাছে যে অপরাধ সঞ্চয় করে গেছেন, তিনি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করবেন মৃত্যুবরণের দ্বারা, বেদনাদহনের দ্বারা। তিনি সমর্পিত ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্পের কাছে।[১৭]

তেমনি করে ত্রিপুরী নির্বাচনের আগে, ঘনায়মান সঙ্কটের পটভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, তিনি নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন ব্যক্তিগত মোহে নয়, আদর্শগত কারণে। একজন প্রকৃত বামপন্থীকে গান্ধীজী মেনে নিলে, তিনি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াবেন।[১৮] আরো পরে, গান্ধীজীকে তিনি লিখেছেন, গান্ধীজী যদি সংগ্রামের ডাক দেন, তিনি অনুগত সৈনিকের মতো তাঁর পেছনে যোগ দেবেন। অবহেলায় পেছনে ফেলে আসবেন সম্মানের সব অভিমান।[১৯]

এই সুভাষই ১৯৪০ সালের ২৬শে নভেম্বর বড়লাটকে লিখেছিলেন, ত্যাগ আর দুঃখবরণের মধ্য দিয়েই আদর্শ বেঁচে থাকে। একটা প্রজন্ম থেকে আদর্শ আর স্বপ্ন ছড়িয়ে যায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। সেইজন্যই তিনি অনশনের স্বেচ্ছাবৃত মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছেন যাতে দেশ বাঁচে, দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে স্বাধীনতার দিনগুলোতে। তাঁর এই পলিটিক্যাল টেস্টামেণ্ট সুভাষচন্দ্রকে নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেবে—যেই সুভাষচন্দ্র প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, সংগ্রামে আপোষহীন আর ত্যাগের মহিমায় ঋষিকল্প। তিনি জানেন, জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় সর্বস্ব ত্যাগ করেই।[২০]

নিজের জন্য সুভাষ কিছু চাইতে পারেন নি বলেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো সুভাষকে যখন ভবিষ্যৎ-ভারতের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছেন, সুভাষ সবিনয়ে জানিয়েছেন, যোগ্যতর ব্যক্তিরা রয়ে গেছেন এখনো, দেশের মানুষই জানাবে কে কোন ভূমিকা নেবে স্বাধীন দেশের শাসনব্যবস্থায়। নিঃসন্দেহে অস্থায়ী সরকারের সর্বাধিনায়কের দিক থেকে এই বিনীত প্রতিবাদ তাঁর নিষ্কাম দেশপ্রীতির পরিচায়ক হয়ে থাকবে।[২১]

আরো পরে, ১৯৪৩ সালের ৬ই জুলাই তিনি গান্ধীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বলেছেন, তাঁরা সবাই ভারতীয় সংগ্রামের নিবেদিত সৈনিক। তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতার পর রাজনীতি থেকে সরে যাবেন, যারা থাকবেন তাঁরা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবেন স্বাধীন ভারতের যে কোনো সামান্য পদ বা জীবিকা। বৃটিশ শাসনের উচ্চতম পদের চাইতে স্বাধীন ভারতের মেথরের কাজও হবে তাঁদের কাছে অনেক বেশী গৌরবের।[২২]

তাহলে এই মানুষটার সঙ্গে বিরোধ হল কেন? যাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, পদলোভ নেই, নেই কর্তৃত্বের মোহ, তাঁকে কেন বিদায় নিতে হল এমন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হিসেবে? তার উত্তর

একটাই—আদর্শের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে সুভাষ চিরদিনই আপোষ-হীন। লক্ষ্য থেকে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হতে পারেন না।[২৩] তাঁর চিন্তায় বা কাজে কোনো অস্পষ্টতা নেই, কোনো কুহেলি নেই, আলো আর অন্ধকারের মধ্যে কোনো কৃত্রিম বন্ধন নেই। এই ঋজু-বলিষ্ঠতা তাঁর চরিত্রের গুণ আবার দুর্বলতাও।[২৪] তিনি নিজেও বলে-ছেন, তিনি চরমপন্থী, তাঁর কাছে জোড়াতালি নেই কোনো।[২৫]

এই বলিষ্ঠতার জন্যই তিনি গান্ধী-বিরোধিতায় জাতীয় নেতৃ-ত্বের সর্বোচ্চ পদ থেকে নির্বাসিত হবার ঝুঁকি নিয়েছেন নির্দ্বিধায়, নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে ক্ষমতালাভের মসৃণ পথ বেছে নেন নি।[২৬]

এ কথা না বুঝলে সুভাষচন্দ্রকে বোঝা যাবে না কিছুতেই। সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের শেষ মানস-সন্তান।[২৭] তাঁর আসল পরিচয় এই নির্ভীকতায়, এই প্রেমের সন্ন্যাসেই ॥

॥ দুই ॥

কিন্তু গান্ধী ও তাঁর শিষ্যেরা সত্যিই কি মানসিকতা বা আদর্শ-গত ক্ষেত্রে একই শিবিরের অন্তর্ভুক্ত? ইতিহাস একথা প্রমাণ করেছে যে, সুভাষ-বিরোধিতায় তাঁরা একই রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালেও, তাঁরা ভিন্ন মেরুর অধিবাসী, স্বার্থের টানে তাঁরা একজোট হয়েছেন বটে, কিন্তু ক্রমে তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন ঐতিহাসিক নিয়মেই।

নেহরু নিশ্চয়ই গান্ধীজীর উত্তরাধিকারী, গান্ধী নিজেই একা-ধিকবার সেটা জানিয়েছেন। কিন্তু গান্ধী আর নেহরুর মধ্যেই তো পার্থক্যটা সব চাইতে বেশী।[২৮] হ্যারো-কেম্ব্রিজের উজ্জ্বল ছাত্র নেহরু দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রনীতি আর ইতিহাস চর্চা করে আধুনিকতার প্রতি-

নিধি হিসেবেই মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর চোখে গান্ধী এক বিচিত্র মানুষ ('medieval catholic monk'), মধ্যযুগের এক সংস্কারাচ্ছন্ন সন্ত যেন। বাইবেল-রামায়ণ-মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সঙ্গে থরো-রাশকিন-টলস্টয়ের দর্শনের এক অদ্ভুত রাসায়নিক মিশ্রণে গান্ধীবাদের জন্ম—সেই জন্যই নেহরু প্রথমে গান্ধীজীকে দূরে রেখেছেন, তাঁর মত ও পথের সমালোচনা করেছেন অকুণ্ঠ চিত্তেই। তিনি অনায়াসে তাই স্বীকার করেছেন, গান্ধীজীর অহিংসানীতি আর অর্থনৈতিক ভাষ্য ভারতবর্ষের কেউই সামগ্রিকভাবে মেনে নিতে পারে নি।[২৯] মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়েছে, গান্ধীর লক্ষ্য অত্যন্ত অস্পষ্ট, দীর্ঘ সান্নিধ্যেও তাঁকে যেন ঠিক চেনা যায় না, হয়ত তাঁর নিজের কাছেই তাঁর চিন্তাধারা স্পষ্ট নয়। তিনি মানুষকে টেনেছেন মুক্তির জোরে নয়, ব্যক্তিত্বের টানেই।[৩০]

গান্ধীজী বিশ্বাস করেছেন, জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদের প্রয়োজন নেই, জমিদার তার জমিকে ঈশ্বরের অধিকার হিসেবে মেনে নিয়ে শুধু অছির (Trustee) ভূমিকা পালন করবেন। সমাজতন্ত্রবাদী-নেহরু এই উচ্চ-গ্রামের আদর্শবাদিতা সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূদের কাছে কখনোই আশা করতে পারেন নি। লাহোরে তাই সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন, গান্ধীর অছিতত্ত্ব এক অবাস্তব আদর্শ, কারণ বাস্তবে তা মুষ্টিমেয় মানুষের শোষণ-অধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত করছে।

নেহরু সেইজন্য গান্ধীজীর দাবি সত্ত্বেও তাঁকে সমাজতন্ত্রবাদী বলে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন, গান্ধীজী সময় সময় নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলেন। কিন্তু তিনি যে অর্থে কথাটা ব্যবহার করেন, তা তাঁর নিজস্ব, তার সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ বলতে যা বোঝায়, সেই অর্থনৈতিক সমাজবিন্যাসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। গান্ধীজীর সমাজতন্ত্র আসলে এক ধরণের ভ্রান্ত মানবতাবাদ।[৩১] নেহরু আরো নির্মম হয়ে উঠেছেন গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতি ও শিল্পায়ন-বিরোধিতার বিরুদ্ধে। নেহরুর মনে হয়েছে, গান্ধীজী

শিল্পায়নের একেবারে বিরুদ্ধে না হলেও ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেন। সেইজন্যই বলা চলে, গান্ধীজীর প্রিয় চরকা-খাদি-তাঁত, পণ্যোৎপাদনের ব্যক্তিগত উদ্যম দেশকে প্রাক্-যন্ত্রযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।[৩২] নেহরু যদিও অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, গান্ধীজী এক্ষেত্রে ঘোর নীতিবাদী। তিনি চেয়েছেন, জনসাধারণ একটা সাদাসিদে জীবন-যাত্রার মানে বাঁধা থাকবে, কেননা আর্থিক প্রাচুর্য্যই বিলাসিতা ও পাপের স্রষ্টা। তিনি চেয়েছেন স্বেচ্ছাকৃত সংযম। গান্ধীজী ভাবতেন, শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূলে আছে তাদের নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতা, তাদের ব্যক্তি-জীবনের অসংযম।[৩৩]

মানসিকতায় নেহরু আধুনিক বলেই গান্ধীজীর অযৌক্তিক অধ্যাত্মবাদও তাঁর পছন্দ নয়, বিশেষ করে, গান্ধীজী যেভাবে রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন তাতে তাঁর বাস্তবতাবোধ সম্বন্ধেই নেহরুর সন্দেহ জাগে। কথায় কথায় গান্ধীজীর ঈশ্বর-স্মরণ নেহরুকে আদৌ তৃপ্ত করতে পারে নি।[৩৪]

গান্ধী-নেহরুর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রেও প্রকট হয়ে উঠেছে। গান্ধীজী চেয়েছেন 'স্বরাজ' যদিও তিনি এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কোনোদিনই দেন নি। সম্ভবতঃ তাঁর নিজের কাছেও সংজ্ঞাটা পরিষ্কার ছিল না।[৩৫] তবে এটা ঠিক যে, তিনি বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ভারতের কথা ভাবতেই পারতেন না। তাঁর 'ডোমিনিয়ান্ ষ্ট্যাটাস' এবং 'সাব্‌ষ্টেন্‌স্ অফ্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্‌স্' প্রভৃতি তত্ত্বগুলো ইংরেজের অধীন স্বায়ত্বশাসনই বোঝায়। অথচ নেহরু প্রথম থেকেই চেয়েছেন, পূর্ণ স্বাধীনতা।' এর জন্য তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্‌স্ লীগ-ও গড়েছেন। নেহরু পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে ঝুঁকেছিলেন কারণ, তাঁর মতে, 'ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস'-তত্ত্বের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের ছোঁয়া লেগে আছে, 'স্বাধীনতা' শব্দটা আরো বিপ্লবাত্মক, প্রচলিত চিন্তাধারার এক দীপ্ত ব্যতিক্রম।[৩৬]

নেহরু মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রাক্কালে দেশে ফিরে সোস্যালিজমের প্রচার শুরু করেছিলেন। তাঁরই আগ্রহে এই কংগ্রেসে স্বাধীনতা-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।[৩৭] ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসেও বাম-পন্থীরা এই লক্ষ্য তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী প্রস্তাব আনলেন ১৯২৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে বৃটেন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দিলে কংগ্রেস তা মেনে নেবে। মাদ্রাজ-প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু নেহরু-সুভাষের বিরোধিতার রূপ দেখে গান্ধীজী শঙ্কিত হলেন। সুভাষ বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের তীব্র সমালোচনা করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি এবং নেহরু নবীনদের মধ্যে মধ্যপন্থী, তাঁদের সঙ্গেই যদি কংগ্রেস-নেতৃত্ব সমঝোতা না করতে পারেন, তবে সঙ্কট অনিবার্য্য হয়ে উঠবে।

মাদ্রাজ-কংগ্রেসের ব্যাপারেই গান্ধীজী নেহরুকে লিখেছিলেন—তুমি বড্ড দ্রুত চলতে চেষ্টা করছ— (you are going too fast). এবার তিনি আরো ক্ষুব্ধ হলেন। নেহরু তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এক পক্ষের বিপ্লববাদ এবং অপরপক্ষের বিবর্ত্তনবাদ ছাড়া আর কোনো মৌল পার্থক্য আছে কিনা। গান্ধীজী জানিয়ে-ছিলেন যে, নবীনরা বিপ্লবের কথা বলে ক্লান্ত হয়ে গেলে তখন তিনি দেখাবেন বিপ্লব কাকে বলে।[৩৮]

তবু গান্ধীজী চিন্তিত হয়েছিলেন বৈকি। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দৃপ্ত তারুণ্যের পদ-সঞ্চারে তিনি ভবিষ্যতের বিপদের আভাষ পেয়েছেন ইতিমধ্যেই। তিনি জানতেন, তাঁর আপোষপন্থী কর্মসূচী নবজাগ্রত তারুণ্যকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। তাঁর ব্যক্তিত্বের মোহে এদেশের মোহান্ধ মানুষ আর কিছু মস্তিষ্কহীন নেতা অন্ধ আবেগে তাঁর পিছু নিয়েছে সত্যি, কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষে থাকতে হলে তারুণ্যের স্বাভাবিক ক্ষাত্রশক্তিকে বশীভূত করতে হবে। লাহোর-কংগ্রেসের সভাপতি-নির্বাচন উপলক্ষ্যে তিনি মোক্ষম চালটি দিলেন।

এবারের সভাপতি নেহরু স্বয়ং। বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্তটা গুরুত্বপূর্ণ এবং গান্ধীজীর কূটনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক। মতিলাল নেহরু ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের জন্য তাঁর কৃতি সন্তান জবাহরলালের নাম গান্ধীজীর কাছে প্রস্তাব করেছিলেন। গান্ধীজী মতিলালকে বেছে নিয়ে পিতাপুত্র দুজনকেই সন্তুষ্ট করেছেন।[৩৯] এবার জবাহরলালকে সভাপতি-পদে বৃত করে ক্ষাত্রশক্তিকে নির্বিষ করার প্রয়াসী হলেন। এটা লক্ষণীয় যে, দশটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলো গান্ধীজীর নাম সুপারিশ করেছিল, নেহরু আর প্যাটেলের নাম এসেছিল যথাক্রমে তিন ও পাঁচটি কমিটি থেকে। অভ্যর্থনা সমিতি সঙ্গত কারণেই গান্ধীজীকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করেছিল।[৪০] কিন্তু গান্ধীজী শেষ পর্য্যন্ত নেহরুকেই বেছে নিয়ে তাঁর নির্ভুল লোক-চরিত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। এই সভাপতিত্ব পাবার পর থেকেই নেহরু গান্ধীজীর শিবিরে যোগদান করেন। অতঃপর সুভাষচন্দ্রই তরুণ ও বামপন্থী অংশের একমাত্র নেতা হিসেবে থেকে যান।[৪১] বিশেষ করে, এই কংগ্রেসে গান্ধীজী নিজেই স্বাধীনতার প্রস্তাব আনায় নেহরুর কাছাকাছি আসতে তাঁর অসুবিধে হয় নি।

তবু গান্ধীজী নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তিনি জানতেন যে. নেহরুর পক্ষে তাঁর অন্ধ আনুগত্য সহজে সম্ভব নয়। নেহরু তত্ত্বগত ব্যাপারে বিপরীত শিবিরের তো বটেই, অন্যদিক থেকেও বড্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী। নেহরু সেটা নিজেও স্বীকার করেছেন।[৪২] সেইজন্য গান্ধী আর এক ধাপ এগিয়েছেন। ১৯৩৬ সালে আবার সভাপতি-পদে বরণ করলেন নেহরুকে। এবারেও নেহরুর প্রতিদ্বন্দ্বী গান্ধীজীর অন্ধভক্ত প্যাটেল। বামপন্থী নেহরুকে প্যাটেল-রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ গান্ধীজীর গোঁড়া ভক্তরা প্রীতির চোখে দেখেন নি আদৌ। বিশেষ করে, এতে যে দক্ষিণপন্থার ক্ষতি হবে,—সেটা তারা স্পষ্ট বুঝেছিলেন।[৪৩] কিন্তু গান্ধী তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন। গান্ধীর প্রতি আনুগত্যের জন্যই প্যাটেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে গেলেন।[৪৪]

তবু একটু বাকি ছিল। নেহরু যাতে স্বাধীনতা বা সমাজতন্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি না করতে পারেন, ওয়ার্কিং কমিটিতে রইল গান্ধীরই শিষ্যেরা, ১৯২০ সাল থেকেই যাঁরা রয়েছেন। গান্ধী লিখেছেন: সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামত আমার মতামতের প্রতিধ্বনি মাত্র। জবাহরলাল ও আমার মধ্যে মতপার্থক্য আছে বৈ কি। ভূমি-সংক্রান্ত বা ঐ ধরণের বিষয়ে ওর আদর্শগত মতামতে আমার আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু কাজের বেলা আমি ওর একটা কথাও শুনব না। ...তবে আশার কথা, জবাহরলাল যখন আদর্শের কথা বলে, ও হয়ে ওঠে পুরোপুরি চরমপন্থী। কাজের বেলা কিন্তু তা নয়। তখন ও খুব সংযত আর সতর্কও।[৪৫]

গান্ধীজী তবু শেষ অস্ত্রটা ছাড়তে দ্বিধা করলেন না। আচমকা, ২৯শে জুন নেহরুর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ গোপালাচারী, জয়রাম দাস, দৌলতরাম, যমবালাল বাজাজ, বল্লভভাই প্যাটেল, কৃপালনী আর এস. সি. দেব হঠাৎ পদত্যাগ করলেন, নেহরুর সমাজতন্ত্র-প্রীতির সঙ্গে তাঁরা আর নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছেন না।

পরদিন সবাই ছুটে এলেন ওয়ার্ধায়, গান্ধী-আশ্রমে। এলেন নেহরুও। তিনি এসেই গান্ধীর সাহায্য-প্রার্থনা করলেন।[৪৬] সব মিটে গেল। গান্ধীজী সাপ হয়ে কেটে ওঝা হয়ে বিষ দিলেন ঝেড়ে।

কিন্তু যা বুঝবার, বুদ্ধিমান নেহরু বুঝে নিলেন। গান্ধীজীর খাতায় নাম না লিখিয়ে যে ভারতীয় রাজনীতিতে কল্কে পাওয়া যাবে না, এটা জেনে তাঁর পক্ষে আর সরে যাওয়ার উপায় নেই।

এর চাইতে যন্ত্রণার আর কিছু নেই। তবু ক্ষমতা-লোভই হয়ত মানুষের সব চাইতে বড় লোভ, এর জন্য বিসর্জন দেওয়া যায় সব কিছু। গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ প্রত্যাহার করে নেওয়ায় নেহরু তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। আবার ১৯৩০ সালের আন্দোলনকেও গান্ধীজী অযৌক্তিকভাবে বন্ধ করে দেও-

য়ার পর নেহরু প্রতিবাদ করেছেন।[৪৭] তাঁর কাছে মনে হয়েছিল গান্ধীজী যেন মাঝে মাঝে সবাইকে চমকে দেন, তাঁর কাজ রহস্য-জনক হয়ে ওঠে। উত্তরে গান্ধীজী মেনে নিয়েছিলেন এই অভিযোগ, জানিয়েছিলেন যে, সত্যিই এক অজানা রহস্য তাঁকে বারবার হাত-ছানি দেয়।[৪৮]

অথচ এই গান্ধীজীকেই মেনে নিতে হবে। তাঁর শরণ নিতে হবে রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। এই গান্ধীজীই নেহরুকে ১৯২৮ সালে লিখেছিলেন: তোমার ও আমার পার্থক্য এত বিস্তৃত, ব্যাপক এবং মৌলিক যে আমাদের উভয়ের একসঙ্গে দাঁড়াবার কোনো মিলনভূমি আছে বলে আমি ভাবতে পারি না।[৪৯]

অথচ রাজনৈতিক প্রয়োজনে উভয়েরই দরকার পরস্পরকে। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তো বটেই, কিছুটা হৃদয়ের বন্ধনও এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। গান্ধীজী ও নেহরু উভয়েই মূলতঃ প্রয়োজনের দিকটাকে মনে রেখেছেন।[৫০]

নেহরুকে কুক্ষিগত করার পর এবং সুভাষচন্দ্রের বহিস্কারের ফলে গান্ধীর সমস্যা মিটে গিয়েছিল। তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনা ছিল না। আজাদ লিখেছেন, এঁদের নিজস্ব চিন্তাশক্তি ছিল না, গান্ধীজীর মতে সায় দেওয়াই ছিল এঁদের একমাত্র কাজ। এঁরা গান্ধীজীকে বুঝতেন না, বুঝতে চাইতেনও না।[৫১]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেসের ওপর গান্ধী-জীর প্রাধান্য ছিল অপ্রতিহত, যদিও ১৯৩৪ সালের পর তিনি আর কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যও ছিলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কংগ্রে-সের আভ্যন্তরীন সংকট সৃষ্টি করেছিল। আর সেই সঙ্গে গান্ধী-নেতৃত্বে এল প্রথম সমবেত প্রতিরোধ। গান্ধীজী চাইলেন ইংরেজের সঙ্গে সর্ত্তহীন সহযোগিতা, আর গান্ধী-শিষ্যরা প্রস্তাব গ্রহণ করলেন ইংরেজ পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাস দিলেই তাকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে কংগ্রেস

প্রথম প্রতিবাদ এল সীমান্ত গান্ধীর মুখ থেকে। তিনি জানালেন ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করার অর্থই হল অহিংসা-নীতিকে বিসর্জন দেওয়া। দীর্ঘদিনের সযত্ন-লালিত অহিংসা-নীতির এই অন্তিম দশা দেখে গান্ধীজী ব্যথিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। তবে বেশীদিন নয়, প্যাটেল ফিরে এলেন। বাজাজ আর ভুলাভাই আসফ আলী আর সৈয়দ মামুদেরও স্বস্থানে আসতে দেরী হল না। এলেন নেহরুও। অনুতপ্ত, পথভ্রষ্ট নেহরু গান্ধীজীর পদপ্রান্তে আবার আশ্রয় নিলেন।[৫২] কিন্তু এত সহজে ভোলেন নি গান্ধীজী। সেইজন্য ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলনে সত্যাগ্রহীদের তালিকায় প্রথম স্থান পেলেন এরা কেউ নন, সেদিনের অখ্যাত শিষ্য বিনোবা ভাবে।

ক্রিপ্‌স্ এদেশে আসার পরে বিরোধটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। নেহরু-আজাদ-এঁরা ক্রিপ্‌সের মিষ্টি কথায় ভুলে বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতায় প্রস্তুত। কিন্তু বাধ সাধলেন গান্ধীজী। বৃটেনের যুদ্ধ-কালীন সঙ্কট আর জাপানের পদধ্বনি তাঁকে তাঁর শেষ সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করল। তিনি ভারত-ছাড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিলেন। নেহরু-প্রমুখ নেতারা আপত্তি তুলেও শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হলেন। গান্ধীজীর এক গোঁড়া শিষ্য রাজা গোপালাচারী জানালেন, এই আন্দোলন দেশব্যাপী বিপর্য্যয় বয়ে আনবে।[৫৩] কিন্তু সঙ্কল্পে দৃঢ় গান্ধীজী দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে জানালেন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—এটাই আমার জীবনের শেষ সংগ্রাম, সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে গেলেও আমাকে আর ফেরানো যাবে না।

বৃটিশ নির্মমভাবে এই আন্দোলন দমন করেছিল সত্যি। কিন্তু ততদিনে গান্ধী-শিষ্যরা সাবালক হয়ে গেছেন। শুরু করেছেন গান্ধীজীকে এড়িয়ে বৃটেনের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা। গান্ধীজী অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু ভারত-ভাগের প্রস্তাব এসেছে

তাঁরই শিষ্য (এবং বেয়াই) রাজাজীর কাছ থেকে।[৫৪] গান্ধীজী জানিয়েছিলেন যে তাঁর মৃতদেহের ওপরেই দেশভাগ হতে পারে। অথচ তাঁর শিষ্যবর্গ দেশভাগের ব্যাপারেই আড়ালে বৃটেনের সঙ্গে কথা বলেছেন দীর্ঘদিন ধরে। গান্ধী নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন ব্যাপারটা। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, নেহরু-প্যাটেল প্রমুখ নেতারা তাঁকে এড়িয়ে বৃটেনের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করছেন।[৫৫] গান্ধীজী এটাও বুঝেছেন যে, তাঁর শিষ্যরা এবার রণক্লান্ত। তাই ক্ষমতার লোভ তাঁদেরকে বৃটেনের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে।[৫৬]

গান্ধী-শিষ্যরা ততদিনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। বাধা দিতে পারতেন গান্ধীজী আর আজাদ—এঁরা দুজনেই ছিলেন ভৌগলিক ঐক্যের পক্ষে। কিন্তু ভারত-ভাগের প্রস্তাব গৃহীত হল যখন গান্ধী সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য স্থানান্তরে, আজাদ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। অবশ্য দেশভাগের উৎসাহী নেতারা যতদিন পেরেছেন ব্যাপারটা গান্ধী-আজাদের অগোচরে রেখেছেন অত্যন্ত সযত্নে।[৫৭] গান্ধীজী অবশ্য শেষ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন যখন জানালেন যে, অন্যান্য নেতারা প্রস্তাবটা সমর্থন করেছেন, গান্ধীজী একা এই ভৌগলিক ঐক্যের জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হবেন—গান্ধীজী তখন থেকেই বাস্তব সত্যটা মেনে নিয়েছেন। বড়লাটের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেই প্রার্থনা সভায় জানিয়েছিলেন যে, ভারত-ভাগের ব্যাপারে ইংরেজের দোষ নেই, এ দেশের হিন্দু-মুসলমানই এর জন্য দায়ী।[৫৮]

এতদিন পরে গান্ধীজী এবারে নিঃসঙ্গ নায়ক। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ব্যর্থ হয়েছে। অনুগত শিষ্যরা পৃথক পথ খুঁজে নিয়েছেন, তাঁর অগোচরে তাঁরই আদর্শ-বিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেম নি একটুও। কিছুদিন আগেও এটা কল্পনা করা যায় নি।[৫৯]

স্বাধীনতার পর দূরত্বটা আরো বেড়েছে। পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেওয়া নিয়ে গান্ধী চাপ দিয়েছেন। প্যাটেলকে রাজী করানোর জন্য তাঁকে অনশনের অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়েছে। তার-পরেও আবার অনশনের হুমকী এল। দিল্লীতে সংখ্যালঘু-নিধনের অবসান ঘটাতে হবে—গান্ধী-নেহরু এবার প্যাটেলের ওপরেই দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন। গান্ধীজীর অনশন কার্য্যতঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেলের বিরুদ্ধে অনাস্থাই সূচীত করছে। প্যাটেল প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন এতে। তাঁর মতে, গান্ধীজী এতে গোটা বিশ্বের সামনে হিন্দুদের মুখে কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছেন।[৬০]

তার কিছুদিন পরেই সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড। কিন্তু এই যে শেষবারে গান্ধীজী দিল্লী গেলেন, ষ্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কে কে ছিলেন? বিশ্বেস করুন, কেউ না। শিষ্যদের কেউ সেদিন নিঃসঙ্গ নায়ককে আনতে যান নি। এটাই ছিল বাস্তব পরিস্থিতি।[৬১] আর গান্ধীজীর প্রাণরক্ষার জন্য কতটা সতর্কতা নিয়েছিলেন নেতারা? বিশেষ করে, ২৯শে জুনের সেই ট্রেন ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টার পরে? অন্ততঃ জয়প্রকাশ নারায়ণ এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেলের ত্রুটিকে ক্ষমা করতে পারেন নি।

গান্ধীজী একদিন বড় দুঃখে প্যাটেলকে লিখেছিলেন যে, তিনি এখন বোঝা হয়ে গেছেন ((I am deadweight in the Congress)। কি করুণ এই আত্মোপলব্ধি ! যাঁরা তাকে সারা-জীবন ব্যবহার করলেন ক্ষমতা-দখলের নির্মম স্বার্থে, তাঁদের কাছে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। মদনমোহন মালব্য একদিন বলেছিলেন, স্বাধীনতার পর গান্ধীজীর শিষ্যরাই তাঁকে হিমালয়ে পাঠিয়ে দেবে।[৬২]

ইতিহাসের পরিণতিটা হল আরো করুণ।

ইতিমধ্যে অবশ্য গান্ধী-গোষ্ঠীতেই ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। সব চাইতে কঠোর দ্বন্দ্ব নেহরু-প্যাটেলে। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস-সভাপতির পদ নিয়ে প্যাটেলের ক্ষোভের কথা আগেই বলেছি। দ্বন্দ্ব

আবার দেখা দিল ১৯৪৬ সালে—বিষয় সেই সভাপতি-পদ। এবারে প্যাটেল আরো নিশ্চিত নিজের দাবি সম্বন্ধে। বিশেষ করে, নেহরুর নাম কোনো রাজ্য থেকে আসে নি। কিন্তু বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আজাদ নেহরুর নাম প্রস্তাব করলেন। গান্ধীজীও এটা মেনে নিলেন। ক্ষুব্ধ প্যাটেল এবার গান্ধী-নেহরু-আজাদ সবাইর ওপরেই ক্ষুব্ধ হলেন। কৃপালনীও নেহরুর নাম করেছিলেন, এইজন্য প্যাটেলের কাছ থেকে তিনি কখনো ক্ষমা পান নি।[৬৩]

মন্ত্রীসভাতেও নেহরু-প্যাটেল মতানৈক্য দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ব্যাপারে। চীন-সংক্রান্ত নীতি নিয়ে ওঁদের বিরোধ ঘটেছে।[৬৪] প্রথম রাষ্ট্রপতি-মনোনয়ন নিয়েও তাঁদের মত পার্থক্য ঘটেছে, কারণ নেহরু চেয়েছিলেন রাজাজীকে, প্যাটেলের পছন্দ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে। শেষ পর্য্যন্ত প্যাটেলের ইচ্ছেই রূপলাভ করল। কিন্তু নেহরু-প্যাটেল বিরোধ সব চাইতে জটিল হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে। নেহরু চেয়েছেন প্রাধান্য। প্যাটেলের মতে, প্রধানমন্ত্রী অন্য মন্ত্রীদের সমান ('Primus inter pares'). এক সময় নেহরু টেবিল চাপড়ে প্যাটেলকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। ব্যাপারটা এত দূর গড়িয়েছিল যে, এক সন্ধ্যায় গান্ধীজীকে মীমাংসায় বসবার জন্য ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেই সন্ধ্যেতেই গান্ধীজী নিহত হলেন, সেই শোক-বিহ্বল পটভূমিতে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বটা ধামা-চাপা পড়ে গেল।[৬৫]

ক্ষমতা-দ্বন্দ্বে রাজেন্দ্রপ্রসাদও নিরুৎসাহিতা দেখান নি। তিনি ক্যাবিনেটে থেকেও গণপরিষদের সভাপতির ভূমিকা চাইলেন (কারণ তাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সুবিধে)। প্যাটেল-নেহরু চাইলেন দ্বিতীয় কাউকে। গান্ধীজী পর্য্যন্ত এর জন্য প্রসাদের ওপর ক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু প্রসাদের সঙ্গে নেহরুর বিরোধ বেড়েছে আরো পরে, প্রসাদ যখন ভাবী রাষ্ট্রপতি। তিনি চেয়েছেন কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা, নেহরুকে এই নিয়ে তিনি চিঠিও দিয়েছেন। নেহরু চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন শীতলবাদ ও আল্লাদীর কাছে, তাঁরা দুজনেই কিন্তু সমর্থন

জানিয়েছেন নেহরুকে।[৬৬] প্রসাদের কার্য্যকাল শেষ হবার পর নেহরু তাঁকে দ্বিতীয়বার মনোনয়নের বিরোধী ছিলেন, যদিও প্রসাদ শেষ পর্য্যন্ত আর একবারের জন্য সুযোগ পেয়েছিলেন। এবারে নেহরু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই।[৬৭] কিন্তু বিরোধটা আরো বেড়েছে। তৃতীয়বারে প্রসাদের ইচ্ছে থাকলেও নেহরু আর রাজী হন নি। ততদিনে কৃপালনী সরে গেছেন। ভিন্ন দল গড়েছেন তিনি। বিভিন্ন ব্যাপারে নেহরুকে তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন বিরোধী-দলনেতা হিসেবে। তবে আক্রমণের ধারটা তীক্ষ্ণতম হয়ে উঠেছে নেহরুর তিব্বত-নীতির ব্যাপারে।[৬৮] রাজাজীও গড়েছেন স্বতন্ত্র দল, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সমালোচনাও নির্মম হয়ে উঠেছে। শাসকদের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা তাঁকে ভীত করে তুলেছিল। দীর্ঘদিনের সঙ্গীদের মতভেদের পর তিনি বৃদ্ধ বয়সেও নতুন পথে পা বাড়িয়েছিলেন।[৬৯]

গান্ধীজী আর গান্ধীচক্রের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা একটু দীর্ঘ হল। কিন্তু এর দ্বারা বোঝা যাবে যে, এঁরা মতবাদ বা কার্য্যক্রমের দিক থেকে আসলে কাছাকাছির মানুষ ছিলেন না। কিন্তু সাময়িকভাবে এঁদের গান্ধীজীর ছত্রছায়ায় থাকতে হয়েছে। সুভাষকে প্রতিহত করার ব্যাপারে গান্ধী-শিষ্যরা সবাই গান্ধীজীকে সামনে রেখে একত্রিত হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ শত্রুর অপসারণের পর সেই চিরন্তন সত্যই জয়ী হয়েছে, ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সুবিধেবাদী সমঝোতা।

॥ তিন ॥

গান্ধীজী ও সুভাষের পথ যে আলাদা হয়ে যাবে সেটা বোঝা—গিয়েছিল তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকারেই। কেমব্রিজ থেকে দেশে

ফেরার প্রথম সুযোগে সুভাষ বম্বের মনিভবনে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। সুভাষ গান্ধীজীকে তিনটে প্রশ্ন করেছেন :

১. কেমন করে কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলন শেষ সংগ্রামে পরিণত হবে ?

২. কেমন করে করবন্ধ এবং আইন-অমান্য আন্দোলন বৃটেনকে পর্য্যদস্ত করবে ?

৩. কেমন করে গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি-মতো স্বরাজ আসবে এক বছরেই ?

সুভাষ নিজেই লিখেছেন, প্রথম প্রশ্নটার উত্তর তাঁকে সন্তুষ্ট করলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরগুলো ছিল অস্পষ্ট। গান্ধীজী নিজেই ভাল করে জানেন না তাঁর আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপ কি করে তাঁকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।[১০] তরুণ নায়কের এই দ্বিধা গান্ধীজী বুঝেছিলেন ঠিকই, তাঁকে দেখা করতে বলেছিলেন চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে।

সুভাষচন্দ্র কলকাতায় এসে যখন দেশবন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করলেন, তাঁর মনে হল এই মানুষটার চিন্তাধারা অত্যন্ত পরিষ্কার। সুভাষ বুঝলেন, তিনি তাঁর নেতাকে এতদিনে খুঁজে পেয়েছেন, দেশবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার জন্য তিনি মনে মনে তৈরী হয়ে গেলেন। দেশবন্ধুর অনুগামী হিসেবেই দিনে দিনে তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকে সরে গেছেন বিকল্প পথে।

তিনি দেখেছেন, গান্ধীজীর আন্দোলন বারবার ব্যর্থ হয়ে গেছে তাঁর অস্থিরতা ও চিন্তার অস্পষ্টতার জন্য। তিনি তাঁর প্রথম আন্দোলন শুরু করেছিলেন দারুণ সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে। যদিও অনেক চিন্তাশীল মানুষ ও জননেতা অসহযোগ ও সত্যাগ্রহকে গ্রহণ করতে পারেন নি, তবু গন্ধীজীর প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল ১৮৮৬-৮৮৪ ভোটে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল, অ্যানি বেশান্ত, মদনমোহন মালব্য এবং জিন্না প্রমুখ নেতা তীব্র আপত্তি তুলেছেন, গান্ধী তাঁর প্রস্তাবের সপক্ষে অধিকাংশের সমর্থন পান।

অবশ্য ডঃ আম্বেদকর লিখেছেন যে, ভাড়া-করা বহু লোককে (তার মধ্যে বেশী ছিল ট্যাক্সিচালক) এই ভোটযুদ্ধে গান্ধীজীর তরফে নিয়োগ করা হয়েছিল।[৭১]

বস্তুতঃ, কংগ্রেসকে দিয়ে এই প্রস্তাব পাশ করানোর ফলে গান্ধীর প্রতিপত্তি বেড়ে গেল ইতিমধ্যে তিলক দেহত্যাগ করেছেন, গান্ধীজী তখন এক রকম প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। নাগপুরের অধিবেশনে মনে হয়েছিল চিত্তরঞ্জন তাঁকে বাধা দেবেন। কিন্তু বাস্তব কারণেই চিত্তরঞ্জন গান্ধীর প্রস্তাব মেনে নেন। শুধু মালব্য, বেশান্ত, পাল আর জিন্না বিপক্ষে রয়ে গেলেন।

গান্ধীজীর প্রস্তাবে আদালত, সরকারী চাকুরী আর সরকারী বিদ্যালয় ত্যাগ —এই আন্দোলনের কর্মসূচী হলেও তা জনসাধারণের সব চাইতে আকর্ষণীয় ছিল এর বিনিময়ে এক বছরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি। বলা বাহুল্য, গান্ধীজী এই আন্দোলনের একচ্ছত্র নায়ক ('dictator'—শব্দটা লক্ষ্যণীয়) মনোনীত হলেন।

প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্স্-এর ভারত আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই ঘটল হরতাল। সাম্প্রদায়িক সমস্যাও তুঙ্গে উঠল। কলকাতায় তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে কি ঘটবে, সরকার তা বুঝতে পেরে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে চাইলেন। কথাবার্ত্তার সুবিধের জন্য মদনমোহন মালব্যকে বড়লাটের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেসিডেন্সী জেলে চিত্তরঞ্জনের কাছে পাঠানো হল। প্রস্তাবে বলা হল, সরকার দমনমূলক ব্যবস্থা তুলে নেবে, আইন-অমান্য আন্দোলনে ধৃত বন্দীদের মুক্তি দেবে, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে পরে গোলটেবিল বৈঠক বসবে। বিনিময়ে প্রিন্সের ওপর বয়কট তুলে নিতে হবে।[৭২] সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তরুণ কর্মীরা আপোষ-প্রস্তাবের তীব্র বিরোধী হলেও, চিত্তরঞ্জন এই সুযোগকে বিধি-প্রদত্ত বলেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, গান্ধী-প্রতিশ্রুত এক বছরের সময়সীমা শেষ

হতে চলল. এই অবস্থায় সরকারের আপোষ-প্রস্তাব জনসাধারণের মনে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলবে।

কিন্তু গান্ধীজী রাজী হলেন না। টালবাহানা করতে করতে প্রিন্স ফিরে গেলেন, সরকারেরও আর কোনো গরজ রইল না। ক্ষুব্ধ-ব্যথিত চিত্তরঞ্জন বললেন, জাতির জীবনে এক মাহেন্দ্রক্ষণ ব্যর্থ হয়ে গেল। পরে অবশ্য গান্ধীজী ভুলটা বুঝেছিলেন, কিন্তু তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে।[৭৩]

এটা ঠিক যে, অসহযোগ আন্দোলন একটা উদ্দীপণার সৃষ্টি করেছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্ব-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস একটা সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারত। অন্ততঃ পুরানো কংগ্রে-সের সঙ্গে একটা বিরাট পার্থক্য বোঝা গিয়েছিল।[৭৪] গান্ধীজীর একটা কথাতেই দেশে আগুন জ্বলে যেতে পারত। কিন্তু গান্ধীজী সেদিকে গেলেন না। একটা বিরাট প্রতিশ্রুতির অপমৃত্যু ঘটল অবিশ্বাস্যভাবেই।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী বড়লাটকে-লিখিত চিঠিতে একটা চরমপত্র দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে অভূতপূর্ব উন্মাদনা দেখা দিল। কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী তাঁদের নেতার ডাকে আত্মদানের সঙ্কল্প করেছিলেন, তাঁরা তখনো জানতেন না যে. যুদ্ধের আগেই আত্মসমর্পণ করতে হবে। উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় নির্য্যাতিত গ্রামবাসীরা গান্ধী-অনুসৃত সংযম রক্ষা করতে পারে নি। অহিংস সত্যাগ্রহীদের ওপর তাণ্ডবলীলা চালিয়ে গুলী নিঃশেষ করে চৌদ্দজন পুলিশ একটা বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ায় বিক্ষুব্ধ জনতা তাদের পুড়িয়ে মারে। এত বড় একটা দেশে এই ধরণের বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটতে পারে, বিশেষতঃ পুলিশের বাড়াবাড়ির পরে। কিন্তু গান্ধীজী আচমকা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন।

সুভাষ লিখেছেন, উত্তেজনা যখন তুঙ্গে উঠেছে, এই পশ্চাদপস-রণ জাতীয়-বিপর্যায়েরই সামিল।[৭৫] অভিযোগটা নিশ্চয়ই যুক্তিপূর্ণ।

নেতা হিসেবে গান্ধীজী সত্যিই ভুল করেছেন। একটা সম্ভাবনাপূর্ণ বিপ্লবকে চরম মুহূর্তে হত্যা করেছেন তিনি।[৭৬] মনীষী রোমাঁ রোলাঁও তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন এই পশ্চাদপসরণকে। তাঁর মতে, সমগ্র জাতি যখন উৎসাহে মেতে উঠেছিল তখন এক বছরের মধ্যে তিনবার আন্দোলন থামিয়ে দিয়ে জনতার আশা আকাঙ্ক্ষাকেই নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল।[৭৭]

দেশবন্ধু-প্রমুখ নেতারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। জেল থেকে লালা লাজপৎ রায় গান্ধীজীকে সত্তর পৃষ্ঠার এক চিঠি দিয়েছিলেন বিরক্তি জানিয়ে। অথচ গান্ধীজী অমার্জিত ভাবে তাঁর সমালোচনা করে বলেছেল যে, জেলে থাকাতে লালাজী 'সামাজিকভাবে মৃত', তাঁর মন্তব্য প্রকাশের অধিকারই নেই।[৭৮]

শুধু তাই নয়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্যতা বর্জন, ধর্মীয় পদ্ধতিতে বস্ত্রবয়ন এবং সংযমের মাধ্যমে স্বরাজ আনার জন্য গঠনমূলক পরিকল্পনা দিলেন। সংগ্রামের পথ থেকে দেশ আবার খাদি আর মাদক-বর্জনের সুমহান ঐতিহ্যে ফিরে গেল। সুভাষ লিখেছেন, ডিক্টেটরের ডিক্রী মানা হল বটে, কিন্তু উত্তাপ সঞ্চিত হল কংগ্রেসকর্মীদের মনে।

তাঁর মতে, তিনটে কারণে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত, গান্ধীজীর হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া উচিৎ হয় নি। সমগ্র কংগ্রেসের বিবেক ব্যক্তিবিশেষের হাতে সঁপে দেওয়ায় বিপর্যায় ঘটে গেছে। দ্বিতীয়ত, এক বছরে, স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়াটা হয়েছিল মূঢ়তা। এর ফলে কংগ্রেসীরা যুক্তিবাদী মানুষের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে গেছে। তৃতীয়ত, গান্ধীজী মুসলমানদের সঙ্গে রফা করার জন্য অযৌক্তিকভাবে খিলাফতের ব্যাপারটা ভারতীয় রাজনীতিতে ঢুকিয়েছিলেন, এর ফলে পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল।

বক্তব্যগুলো নির্মম, কিন্তু নিরর্থক নয়। সত্যিই, একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিবিশেষকে চূড়ান্ত ক্ষমতা-প্রদান বিড়ম্বনাই

বয়ে আনে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। দেশবন্ধু ঠিকই বলেছেন, গান্ধীজী শুরু করেন চমৎকার, কিন্তু তারপরেই ঘাবড়ে গিয়ে ঘামতে থাকেন।

এক বছরের স্বরাজের প্রতিশ্রুতিটাও হয়েছে ছেলেমানুষী ব্যাপার। গান্ধীজী স্বরাজ-সংগ্রহের চূড়ান্ত দিনটি তারপর পরিবর্তন করেছেন।[৭৯] এতে ভেতরের গোঁজামিলটাই ধরা পড়েছে। গান্ধীবাদীরা অবশ্য কূটতর্ক তুলে বলেছিলেন, দেশের লোক গান্ধীজীর সর্ত্ত পালন করে নি বলেই প্রতিশ্রুতিটা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: অতি সত্বর অতি দুর্লভধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজী হয় না, তাদের পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে।

আরো বড় কথা হল, গান্ধীজীর কাছে অসহযোগ আন্দোলনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল খিলাফৎ যা তুরস্কের খলিফার প্রতি ইংরেজের অমর্য্যাদাকর ব্যাপার নিয়ে সৃষ্টি। এ দেশের স্বাধীনতার চাইতেই গান্ধীজীর কাছে খিলাফতের ব্যাপারটা প্রাধান্য অর্জন করা নিশ্চয়ই বিস্ময়কর।[৮০] বিশেষ করে, সেটা ভারতের ব্যাপারই নয়, আর এতে মহম্মদ আলী প্রমুখ উগ্র সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিকেই গান্ধীজী উচ্চাসন দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। তুরস্কে খলিফা-পদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের খিলাফতীদের আর কিছু করার রইল না, তাঁদের অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলেন। পোলকের মতে, কংগ্রেসের সঙ্গে খিলাফতের কৃত্রিম বন্ধনটা বিস্তোচিত হয় নি আদৌ।[৮১]

এ-কথা হয়ত বলা হবে যে, গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য খিলাফৎকে অসহযোগের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় যে, ব্যাপারটাতে

কৌশলগত ভুল হয়েছিল। এই ধরণের কৃত্রিম পদ্ধতিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন করা যায় না। হিংসায়-বিশ্বাসী খিলাফৎ-নেতারা গান্ধীজীকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন শুধু।[৮২] তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে, এই আন্দোলনের সময়ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলেছে। বিশেষ করে মোপলা-বিদ্রোহে হিন্দুদের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার ঘটেছে, তা জালিয়ানওয়ালাবাগকে নৃশংসতায় ছাড়িয়ে গেছে।[৮৩] মোপলরা খিলাফৎ আন্দোলন এবং গান্ধী-শিষ্য আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্ররোচনায় উন্মত্ত হয়ে ধ্বংসলীলা চালালেও গান্ধী বলেছিলেন যে, বীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী মোপলারা ধর্মীয় আদর্শ অনুসারে যা ন্যায় মনে করেছে, তাই করেছে। হত্যা, লুঠ, নারী-ধর্ষণ, শিশু-দলন, ধমস্থান অপবিত্রকরণ কিছুই বাদ যায় নি।[৮৪] সরকারী রিপোর্টেও এই নারকীয় লীলার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অথচ সাম্প্রদায়িক ঐক্য-রক্ষার জন্য গান্ধীজী এবং কংগ্রেস-নেতৃত্ব উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে ছিলেন। গান্ধী মুসলমানের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন সব চাইতে ধর্মান্ধ এবং চরমপন্থী অংশকেই যার নেতা ছিলেন আলী-ভ্রাতৃদ্বয়, অথচ এঁদের মুক্তির দাবিতেই তিনি বড়লাটের সঙ্গে বোঝাপড়ার সুযোগ নষ্ট করে আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ, গান্ধীজী যদি সাম্প্রদায়িক ঐক্য চেয়ে থাকেন, তার সব চাইতে বড় বাধা ছিলেন তিনি নিজেই। তাঁর ধর্মাচরণ, রাম-রাজ্যের ঘোষণা, প্রার্থনা-সভা, রামধুন-সঙ্গীত (যাতে আল্লার নাম থাকলেও প্রথম দুটো পঙক্তি ছিল—রঘুপতি রাঘব রাজা রাম/পতিত-পাবন সীতা রাম), নিরামিষ-খাদ্য প্রভৃতি তাঁকে এক হিন্দু-ধর্মীয় নেতা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। কোটি কোটি হিন্দুর কাছে তিনি এক ধর্মীয় সন্ত।[৮৫] কিন্তু সুভাষ জানতেন, নেতাকে ধর্মীয় ব্যাপারে নিজস্ব ধারণাগুলো ব্যক্তিগত পর্য্যায়েই রাখতে হয়। তিনি নিজে সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।[৮৬] সুভাষ ঠিকই বলেছেন, নেতা গান্ধীজী আর দার্শনিক গান্ধীজীর চিরন্তন দ্বন্দ্বই গান্ধীজীর জীবনে বারবার ব্যর্থতা বয়ে এনেছে।

গান্ধীজী তাঁর বড় ছেলে হীরালালকে ত্যাগ করেছিলেন তার নৈতিক অধঃপতনের জন্য। এটা গান্ধীজীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমানরা ধরে নিয়েছিলেন যে, গান্ধীজীর উষ্মার কারণ হীরালালের মুসলমান-বিবাহ। এই ভুল ধারণা দূর করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গান্ধীজী কোনোদিনই নেন নি।

গান্ধীজীর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে কংগ্রেস থেকে জাতীয়তাবাদী নেতা জিন্না বেরিয়ে যাবার পর গান্ধীজীই তাকে তোষণ করে চলেছেন দীর্ঘকাল। তাঁকে উপাধি দিয়েছেন 'কায়েদ-ই আজম' (মহান নেতা)। ক্রমে মুসলমান সমাজ জিন্নার নেতৃত্বের দিকে ঝুঁকেছেন, জিন্নাও সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। সুভাষ বারবার গান্ধীজীকে বুঝিয়েছেন যাতে তিনি সাম্প্রদায়িক নেতাদের প্রশ্রয় না দেন.[৮৭] কিন্তু গান্ধীজীই অসতর্ক মুহূর্তে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছেন, এ দেশের সব সম্প্রদায়ের মনঃপূত না হলে কোনো সর্তই বৃটেনের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। এটাই কাল হয়েছিল। মুসলমান, শিখ, এমন কি ডঃ আম্বেদকর পর্য্যন্ত দাবির মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছেন দিনে দিনে। সুতরাং একথা বলা চলে যে, বৃটেন একদিন যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল, গান্ধীজীর দুর্বলতায় এবং অভিজ্ঞতায় সেটাই দুঃখের মহীরুহ হয়ে উঠেছিল।

।। চার ।।

অসহযোগের পর বিরতি। কিন্তু তাতেও গান্ধীজীর বাস্তব-বোধের অভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের বিরোধিতার এটা নতুন পর্য্যায়।

আন্দোলন প্রত্যাহারের পর স্বভাবতঃই কংগ্রেস-শিবিরে হতাশা আর বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। তা থেকে জাতিকে নতুন এক প্রাণ-স্পদনে উদ্দীপ্ত করে তোলার জন্য দেশবন্ধু নতুন পথের সন্ধান দিলেন জেলে বসেই। তাঁর মনের কথা বাসন্তীদেবী চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সন্মেলনে জানালেন। এবার রণকৌশল বদলাতে হবে। আইন-সভার ভেতরে ঢুকে তাকে ভেতর থেকে অচল করে দিতে পারলে জাতীয় আন্দোলনে নতুন প্রাণের জোয়ার আসবে। দেশবন্ধু বোঝালেন যে. সংগ্রামের সময় কোনো দূর্গই শত্রুর হাতে ছেড়ে দিতে নেই। সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। কংগ্রেস নির্বাচনে না গেলে. আসন খালি থাকবে না, অন্য বাজে লোক যাবে। ইংরেজ দেখাবে স্বৈরাচারী ব্যাপারগুলোও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভা থেকেই গৃহীত হয়। কংগ্রেস যদি নির্বাচনে জেতে, ভেতর থেকে সরকারকে বাধা দিয়ে ডায়ার্কি অচল করে দেওয়া যাবে, সরকার তখন হয়ত গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতার মাধ্যমে আইনপ্রনয়ণ করবে। তাতে সরকারের অগণতান্ত্রিক রূপটা প্রকট হয়ে উঠবে, জনমত সংগঠিত করা যাবে সহজেই।

কিন্তু গান্ধী-প্রভাবিত কংগ্রেস তাঁর বক্তব্য অনুমোদন করে নি। গয়া-কংগ্রেসে পরাজয় স্বীকার করে চিত্তরঞ্জন এসেছিলেন বটে, কিন্তু নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কর্মস্রোতে। কংগ্রেস-সভাপতির পদ ত্যাগ করে তিনি গড়লেন স্বরাজ্য দল। সুভাষচন্দ্র তখনো তাঁর বিশ্বস্ত সহচর।

মাত্র দু-মাস প্রস্তুতির সুযোগ পেলেও স্বরাজ্য দল নির্বাচনে খারাপ করে নি। কেন্দ্রীয় আইনসভার ১০৫টা নির্বাচিত আসনের মধ্যে স্বরাজ্যদল ৪৮টা আসন দখল করেছিল। তাদের বাদ দিয়ে কোনো সরকারের পক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখা অসম্ভব ছিল। স্বরাজ্য-দল ইন্ডিপেন্ডেণ্ট পার্টির সঙ্গে সমঝোতায় আসার পর বহু ক্ষেত্রেই সরকারকে পরাজয় বরণ করতে হয়। মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্যদল

সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। সেখানে সরকার বাজেট পাস করতে পারল না, মন্ত্রীসভা টিকল না। বাংলায়ও মন্ত্রীসভা চালানো অসম্ভব হয়ে উঠল। বারবার সরকারের পরাজয় ঘটল। মন্ত্রীদের বেতন-বিল্ পাশ না হওয়ায় সাপ্লিমেণ্টারী বিল্ আনা হয়েছিল, হাইকোর্টের রায়ে তা আটকে গেল। আইনসভা কিছুদিন মুলতুবী থাকার পরে ১৯২৪ সালের ২৬শে আগস্ট আবার সেই বিল্ ৬৮/৬৬ ভোটে নাকচ হয়ে গেল। ৬৬/৫৭ ভোটে Criminal Law Amendment-Bill বাতিল হল। বাইরের অপেক্ষমান জনতা সেদিন আইন-সভার সদস্যদের কাঁধে তুলে নেচেছে। রাজবন্দীদের অনশন ও বিনাবিচারে গ্রেপ্তার নিয়ে সরকারী মনোভাবের বিরু.দ্ধ প্রতিবাদ করে নির্দল সদস্যরাও বিরোধীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনসভার কক্ষত্যাগ করলে স্পীকার বিঠলভাই প্যাটেল সভা মুলতুবী করে দেন। উত্তেজনা চরমে উঠেছিল স্বাভাবিক কারণেই।

কিন্তু ইতিমধ্যেই দেশবন্ধুর জয় ঘোষিত হয়েছে। নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে আপোষ হয়েছিল—কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে। নয় মাসের মধ্যে গয়া-কংগ্রেসের রায় নাকচ হয়ে গেল। প্যাটেল,রাজেন্দ্রপ্রসাদ. গোপালাচারীর বিরোধিতা কাজে লাগল না আদৌ। তবে ঘটনাটা তাঁরা ভোলেন নি, শোধ তুলেছেন পরবর্তীকালে।

দেশবন্ধুর নতুন কর্মনীতির ঘোষণার সময় থেকেই গোড়া-গান্ধীবাদীরা এর বিরোধিতা করেছেন। বিভিন্ন প্রদেশেই এই নো-চেঞ্জাররা পরিবর্তনপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মেতেছেন। বাংলাতে প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটি হয়েছে, অনেক সভায় গণ্ডগোলও হয়েছে। গান্ধী-পন্থীরা মনে করতেন, আইনসভা-প্রবেশ গান্ধীজীকে অসম্মান করা। বাংলার গান্ধীবাদীরা স্বরাজীদের পরাজিত করার জন্য তাই নানা কৌশল গ্রহণ করেছিল, পরাজিত হয়েও অফিস দখলে রেখেছে, মিটিং ডেকেছে অ-সাংবিধানিক পদ্ধতিতে, অধিবেশনে সদস্য পাঠিয়েছে রীতিবহির্ভূত পন্থায়।

এই সময় সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন স্থানে স্বরাজ্যদলের কর্মসূচীর সমর্থনে জোরালো বক্তৃতা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সরকারের বিভিন্ন স্বৈরাচারী বিলের প্রতিরোধ করা দরকার, সেটা সংগঠিত কংগ্রেস আইনসভার ভেতরেই করতে পারে। বাংলার স্বরাজ্যদলের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে জনসভায় এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে সুভাষচন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হয়েছে। গান্ধীবাদীদের এবং সংবাদপত্রের কুৎসার উত্তর দেবার জন্য দেশবন্ধু যখন 'ফরোয়ার্ড' এবং 'বাংলার কথা' নামে দুটো সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন, সুভাষ নিলেন পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব। এ-সব কারণে সুভাষের বিরুদ্ধে বিপক্ষদলের ক্ষোভ জমছিল। একটা সভায় গুণ্ডারা তাঁর মাথার জন্য সশস্ত্র হয়ে এসেছিল।[৮৮]

ডায়ার্কি অচল করে দিয়ে দেশবন্ধু অবশ্য ইংরেজকে আপোষের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইংরেজও স্বীকার করেছিল যে, ওই অবস্থায় গোঁয়ার্তুমি করার অর্থ হল সন্ত্রাসবাদকে আমন্ত্রণ জানানো। বড়লাট দেশবন্ধুর কাছে গঠনমূলক প্রস্তাব চাইলেন। দীর্ঘদিন ধরে দেশবন্ধুর সঙ্গে ইংরেজের বোঝাপড়া চলছিল। বড়লাট বিলেত ছুটেছিলেন পরামর্শের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার দিনও ঘোষিত হয়েছিল। দেশের দুর্ভাগ্য যে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে দেশবন্ধু দেহত্যাগ করলেন।

ইতিপূর্বে গান্ধীজী অবশ্য জেল থেকে বেরিয়েই স্বরাজ্যদলের কর্মসূচীকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে আইনসভা-প্রবেশ অসহযোগের আদর্শ-বিরোধী। দেশবন্ধু ও মতিলালের সঙ্গে তাঁর বৈঠক ব্যর্থ হয়। এরপর গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, যাঁরা অসহ-যোগ ও বয়কটের বিরোধী, তাঁরা কেউই কংগ্রেস-কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হতে পারবেন না। মতিলাল ও দেশবন্ধু এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। গান্ধীজীও বুঝলেন যে, তাঁর প্রভাব ক্ষীয়মান।

অতঃপর তিনি রণকৌশল বদলেছেন। স্বরাজীদের সঙ্গে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি জানালেন, শিশুকে

যেমন মা আগলে রাখেন, তিনিও তেমনি করে স্বরাজ্যদলকে আশ্রয় দেবেন। বলা বাহুল্য, তিনি কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যভার তুলে দিলেন স্বরাজ্যদলের হাতে, তাঁর গোড়া ভক্তরা অবশ্যই তাঁরই মতো চরকা আর খদ্দরের ব্যাপারেই নিবিষ্ট রইলেন।[৮৯]

গান্ধীজী তাঁর এই পরাজয়ের কথা নিশ্চয়ই ভোলেন নি, বিপক্ষ-শিবিরের তরুণ নায়ক সুভাষচন্দ্রকে তিনি চিনে রেখেছিলেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠবেই: গান্ধীজী যদি স্বরাজ্যদলের সঙ্গে নির্বাচনের আগে সহযোগিতা করতেন, নির্বাচনের ফল নিশ্চয়ই অনেক ভাল হত, ইংরেজকে নাস্তানাবুদ করা যেত আইনসভার ভেতরেই। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা সংগ্রামের চাইতেই গোঁড়ামীর ব্যাপারেই বেশী আন্তরিক থাকায়, বিরাট একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। মজার কথা হল, এই গান্ধীবাদীরাই ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের ভিত্তিতে আইনসভায় প্রবেশ করেছিলেন, তবে সরকার-বিরোধিতার জন্য নয়—মন্ত্রীত্বের জন্য। অথচ ১৯২৪ সালে তাঁরা অসহযোগের তত্ত্বে আঁকড়ে রইলেন গান্ধীবাদকে রক্ষা করার তাগিদে।

আজও অনেকে দেশবন্ধুর কৌশলটা অনুধাবন করতে পারেন নি।[৯০] এঁদের বক্তব্য হল, আইনসভার ভেতরে প্রতিরোধ কার্য্যক্ষেত্রে অর্থহীন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, গান্ধীজীও গান্ধীবাদীদের মতো এঁরাও ব্যাপারটা বোঝেন নি। প্রথমত, লিবারেল, মডারেট প্রভৃতি কংগ্রেসীরা প্রাপ্য ক্ষমতায় আস্থাবান হয়ে উঠেছিল। তাঁদের ভুল ভাঙানো দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত, বৃটিশ-শক্তিকে স্বৈরাচারী ক্ষমতা-ব্যবহারে বাধ্য হওয়ায় তাদের গণতান্ত্রিকতার মুখোশ খুলে গিয়েছিল। তৃতীয়তঃ, আইনসভাকে ভেতর থেকে অচল করে দেশবন্ধু ইংরেজকে অস্থির করে তুলতে চেয়েছিলেন।[৯১] সেদিক বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে, দেশবন্ধু ইংরেজের কাছে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন।[৯২]

অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে, স্বরাজী-নীতি কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল।[১৩] একথাও বলা হয়েছে, নেতৃত্বটা ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর, এতে সাধারণ মানুষ সামিল হন নি।[১৪] এগুলো বড় কথা নয়। দেশে একটা উন্মাদনা স্বরাজ্যদল এনেছিল, গান্ধীজীর আত্মসমর্পণের পর যেটা ছিল একান্ত প্রয়োজন। বিভ্রান্ত-জরাগ্রস্থ দেশবাসীর জাতির মধ্যে নতুন প্রাণস্পন্দনের দরকার ছিল, আইনসভার ভেতরের সংগ্রাম সেটা এনে দিয়েছিল অনিবার্য্য কারণেই। কিন্তু সব চাইতে বড় কথা, আন্দোলন-প্রত্যাহারের পর দেশে যে নির্জীব-নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছিল, তা থেকে মানুষকে সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছিল স্বরাজ্যদলের উত্তেজনাকর রাজনীতি। এক-একবার সরকারের পরাজয় ঘটেছে। উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠেছে সারা দেশ। গান্ধীবাদী কংগ্রেস-ইতিহাসকার পট্টভিও স্বীকার করেছেন যে, সে সময়কার আইনসভার নানা ঘটনায় স্বরাজ্যদলের প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১৫]

সে যাই হোক, গান্ধীজী আর গান্ধীবাদীরা দেশবন্ধু আর তাঁর প্রধান শিষ্য সুভাষকে ততদিনে চিহ্নিত করে ফেলেছেন। রাজনীতিতে ক্ষমা বলে কিছু নেই, ক্ষমতার দর্শনেও নেই উদারতার স্থান।

॥ পাঁচ ॥

সুভাষ গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বেশে দাঁড়িয়েছেন ১৯২৮ সালের কলকাতায় যুব-কংগ্রেসের অধিবেশনে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হিসেবে তিনি মূল গান্ধী-দর্শন নিয়েই টান দিয়েছেন অত্যন্ত দৃপ্ত ভঙ্গীতে। নিরাসক্ত ভাবে তিনি বলেছেন, সবরমতী আশ্রম থেকে বলা হয়েছে—আধুনিকতা খারাপ, বৃহদায়তন শিল্প পাপ, বাসনার

নিবৃত্তি অত্যন্ত প্রয়োজন বলেই জীবনযাত্রার মান উন্নত করার দরকার নেই। এই গান্ধীবাদী দর্শন আমাদের গরুর গাড়ির যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। জীবন-বিরোধী এই নিষ্ক্রিয় দর্শনের বিরুদ্ধেই তাঁর তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ।[৯৬]

তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই পবিত্র দেশে আশ্রম নতুন কোনো জিনিষ নয়। আশ্রমের যোগীরা সম্মানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু মুক্ত, সুখী আর মহান ভারতকে গড়ে তুলতে গেলে তাঁদের পথ আমাদের নিলে চলবে না। আমাদের একালে বাঁচতে হবে, আর সেই জন্যই মানিয়ে নিতে হবে আধুনিক যুগের সঙ্গে। প্রাচ্যের উদাত্ত ঋষিবাক্য আত্মস্থ করেও তথাকথিত আশ্রমের জড় সংস্কারাচ্ছন্ন তত্ত্বের নিন্দায় তিনি কুণ্ঠিত হন নি। সেদিন প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তা কাঁটার মত বিঁধেছে তাঁর দুর্বার গতিচ্ছন্দে।[৯৭]

সেদিন তাঁর বক্তব্যে গান্ধীবাদীরা তো বটেই জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলোও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। পণ্ডিচেরী সম্বন্ধে মন্তব্য করে সুভাষ কিছুটা অশোভনতা দেখিয়েছেন ঠিকই। কারণ শ্রীঅরবিন্দ তার বহুকাল আগে থেকেই যোগসাধনায় নিভৃত জীবন কাটাচ্ছেন, জাতীয় জীবন বা কংগ্রেসকে প্রভাবিত করার কোনো প্রচেষ্টাই তিনি করেন নি। কিন্তু সবরমতী আশ্রমের ধর্ম-নেতা গান্ধীজীর অনাধুনিক দর্শনকে আঘাত করার তখন কি দরকার ছিল না?

সুভাষের মনে হয়েছে গান্ধীজী এক ইতিহাস-অজ্ঞ প্রাচীনপন্থী সন্ত যিনি উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথায় দেশকে পুরনো যুগের অন্ধকার বলয়ে আটকে রাখতে চান। অভিযোগটা নির্মম, কিন্তু অসঙ্গত নয় নিশ্চয়ই।

গান্ধীজী আধুনিক সভ্যতাকে মেনে নিতে পারেন নি, তাঁর কাছে শান্ত-সরল প্রাচীন জীবনই শ্রেয় মনে হয়েছে। পশ্চিমী সভ্যতা আর্থিক সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু গান্ধীজী মনে করেন না যে, তারা

বেশী সভ্য।[৯৮] তিনি চেয়েছেন এক নৈতিকতার জগৎ যেখানে মানুষ লোভের শিকার হয়ে ওঠে না। তাঁর মতে, পশ্চিমী শিল্প-সভ্যতা মানুষকে অর্থের দাস বানিয়ে তুলেছে, কিন্তু বুদ্ধ-যীশু বা শঙ্কর তো আর্থিক প্রতিষ্ঠা চান নি।[৯৯] সেইজন্য গান্ধীজী অর্থনীতি-শিক্ষার জন্য অর্থনীতির তত্ত্ব বা মার্শাল, মিল্‌ বা অ্যাডাম স্মিথের শরণাপন্ন হবেন না। তাঁর চোখে আসল অর্থনীতিবিদ হলেন সন্ত আর দার্শনিকরা। ধর্মীয় বাণীর মধ্যেই শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি খুঁজে নিতে হবে, মানুষের মুক্তি'র পথ দেখাবে অর্থনীতি-গ্রন্থের পাতা নয়, প্রাচীন শিলালিপি।[১০০]

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন বলেই গান্ধীজী বর্তমান পশ্চিমী অর্থনীতির সমৃদ্ধ দিকটাকে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। এমন কি, তিনি জানিয়েছেন, রেল এবং হাসপাতালগুলোর প্রাকৃতিক বিলুপ্তি ঘটলেই তিনি খুশী হবেন।[১০১] তিনি পশ্চিমী ওষুধকে বলেছেন black magic', অস্ত্রোপচার তাঁর কাছে 'an instrument of diabolical vinisection' (যদিও ১৯২৪ সালে তিনি অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করিয়েছিলেন)।

শিল্প-সভ্যতা তাঁর একান্ত শত্রু। শিল্পায়ন তিনি চান নি, কারণ তাতে মানুষেয় নৈতিকতাই বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাঁর মতে, দরিদ্র ভারতবর্ষই ভাল, তবু নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সমৃদ্ধি চাওয়া অনুচিত। এদেশে ম্যাঞ্চেস্টার তৈরী না করে বরং ম্যাঞ্চেস্টারে বস্ত্র কিনে টাকা বিদেশে দেওয়া অনেক সঙ্গত।[১০২]

তিনি মনে করতেন, যন্ত্র মানুষকে দাস বানিয়ে ফেলে। আর এর সঙ্গে জড়িত থাকে শোষণ আর বঞ্চনা। সেই জন্যই এর বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী সংগ্রাম করা দরকার।[১০৩] অর্থনীতির ক্ষেত্রে যন্ত্রশিল্প সৃষ্টি করবে একচেটিয়া আধিপত্য, সাধারণ মানুষ তাতে শোষিত হবে চিরদিনের জন্য।[১০৪]

সেইজন্যই গান্ধীজী চেয়েছেন কুটিরশিল্প। খাদি চরকা আর গ্রামীন জীবন নিয়েই তাঁর স্বপ্নের দেশ গড়ে উঠবে। তাঁর অহিংসা মন্ত্র, গ্রাম, আর চরকা তাই তাঁর দর্শনে একত্রীভূত।[১০৫]

অবশ্য এটা ঠিক, গান্ধীজীর চিন্তাধারা মাঝে মাঝে কিছুটা দিক পরিবর্ত্তন করেছে। তিনি শেষ পর্য্যন্ত বৃহৎ শিল্পকেও কিছুটা মেনেছেন, অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন স্বীকার করেছেন।[১০৬] তবে তিনি শিল্পের প্রসার যেমন চান নি, তেমনি যেটুকু শিল্পায়ন হবে, তা রাষ্ট্রের হাতে রাখতে চেয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলেই দাবি জানিয়েছেন।[১০৭]

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, তাঁব আপত্তি মূলত শিল্পের বিরুদ্ধে নয়, তাঁর আপত্তি শিল্পপ্রধান সমাজে ক্ষমতার কেন্দ্রীকতার বিরুদ্ধে। তিনি রাষ্ট্র এবং শিল্পের কর্ত্তৃত্ব-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছেন।[১০৮]

কিন্তু কার্য্যতঃ, তিনি শিল্পায়নেরই বিরোধিতা করেছেন সারা জীবন। যদিও অন্যান্য রাষ্ট্র শিল্পায়নের মাধ্যমে, বিশেষ করে রাশিয়া ও তুরস্ক পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় দ্রুত সমৃদ্ধি এনেছে, তিনি চরকার সামগান শুনিয়েই দেশবাসীকে নৈতিকতার উচ্চতম গ্রামে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, ভারতের জীবন এবং মৃত্যু নিহিত আছে এই চরকাতেই। চরকার অবলুপ্তি দেশের ধ্বংসই বয়ে আনবে।[১০৯] আরো বিস্ময় জাগে তখন, যখন তিনি বলেন, খাদি শুধু ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি নয়, দেশের স্বাধীনতারও একমাত্র অস্ত্র। খাদি ছাড়া স্বরাজও আসতে পারে না।[১১০]

একথা ঠিক যে, তিনি বুঝেছিলেন, এদেশ জনবহুল বলেই পশ্চিমী যন্ত্র সভ্যতা এদেশের পক্ষে অনুকূল নয়, এতে বেকারত্ব বাড়বে। কিন্তু সেই জন্যই যে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিল্পায়ন দরকার, দেশের সমস্যার সঙ্গে খাপ খাইয়েই যে শিল্প-সভ্যতার দ্বারস্থ হতে হবে, এটা তিনি বোঝেন নি। সেদিন থেকে বিচার করলে তিনি যুগধর্ম মানেন নি— একথা সত্যি।[১১১]

এই সঙ্গে তিনি চেয়েছেন গ্রামীন জীবন। তাঁর আদর্শ হল সমগ্র দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু তো থাকবেই, থাকবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও।[১১২] রাজনৈতিক ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হবে না, এই গ্রামভিত্তিক জীবন থেকেই সত্যিকার গণতন্ত্র গড়ে উঠবে। এই বিকেন্দ্রীভূত শিল্প এবং ক্ষমতার বণ্টনই, তাঁর মতে সমাজে সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।[১১৩] গান্ধীজী এই শোষণমুক্ত সমাজ চেয়েছেন অহিংসার মাধ্যমেই। সেই জন্য তাঁর কল্পিত সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষকে মনে রাখতে হবে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেওয়াটা পাপ। সেইজন্য তিনি জমিদার এবং শিল্পপতিদের যেমন তাঁদের অপরিমিত অর্থের অধিকার স্বীকার করেন নি, তেমনি হিংসাত্মক পদ্ধতিতে তা কেড়ে নেওয়ারও তিনি বিরোধী। তিনি মনে করতেন, এঁরা সম্পত্তিকে ঈশ্বরের সম্পত্তি বলেই মনে করবেন এবং নিজেদের গণ্য করবেন নিছক অছি হিসেবে। এর ফলে শোষণের অবসান ঘটবে।[১১৪] তিনি বলেছেন, কোনো জমিদার এই আদর্শ না মানলে, সবাই অসহযোগিতা করবে। দরকার হয়, গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, তবু নতি স্বীকার করবে না। তিনি আরো বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন হলে জমির মালিক হবে কৃষক। সেটা রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে হতেও পারে। তবে মনে হয়, জমিদাররা সহযোগিতা করবে, এমন কি, প্রয়োজন হলে তারা পালিয়েও যেতে পারে।[১১৫]

রাষ্ট্রকে গান্ধীজী বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে, রাষ্ট্র হল হিংসার এক মাধ্যম। ব্যক্তির হৃদয় আছে, কিন্তু রাষ্ট্রের নেই। রাষ্ট্রের ভিত্তি হিংসায়, সেইজন্য সে হিংসাকে ছাড়তে পারে না।[১১৬] এই কারণে তিনি আসলে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি চান। তবে যতক্ষণ তার অস্তিত্ব আছে, তার কাজ হবে সামান্যতম। এই দিক থেকে বিচার করলে তিনি থরোর শিষ্য, হয়ত টাকারের মতেরও অনুসারী এক 'নব-নৈরাজ্যবাদী'।[১১৭]

গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের মূলমন্ত্র হল অহিংসা। তাঁর মতে, হিংসা নিম্নশ্রেণীর-প্রাণীকেই মানায়, মানুষের ক্ষেত্রে এটা চলা উচিত নয়। আর অহিংসার মন্ত্র শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, সামাজিক জীবনেও এটা অবশ্য গ্রহণীয় হওয়া দরকার। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এটাই হবে আমাদের মূলমন্ত্র।[১১৮] সেইজন্য গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, পুলিশের চাকরীতেও অহিংস-মানুষ নিতে হবে। তাঁদের হাতে অস্ত্র থাকবে হয়ত, কিন্তু তার ব্যবহার দরকার হবে না, তাদের কাজ হবে সংশোধন করা। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও হিংসার কোনো প্রয়োজন হবে না।[১১৯]

এই অহিংসার দর্শন থেকেই জন্ম নিয়েছে সত্যাগ্রহের তত্ত্ব। সত্যাগ্রহ হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ এর দ্বারা অন্যায়-কারীকে সংশোধন করা হয়, তার ভেতরে জাগিয়ে তোলা হয় নৈতিক শক্তিকে।[১২০] এর জন্য সত্যাগ্রহীকে কষ্ট বরণ করতে হয়, কারণ আঘাত খেয়েও তার ভালবাসতে হবে অন্যায়কারীকে। দুঃখের মধ্য দিয়েই হৃদয় দিতে হবে তাকে। হৃদয় দিয়েই হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।[১২১] গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে, বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধেও সত্যাগ্রহের মাধ্যমেই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আত্মসমর্পণের চাইতে অজস্র মানুষের নির্মম মৃত্যু শত্রুর হৃদয়কে দ্রবীভূত করবে, তার সৈনিক-সুলভ নৃশংসতার অবসান হবে।[১২২] তিনি লিখেছেন, আবিসিনিয়ার মানুষ, চেক্ বা পোলিশ জাতি এই পদ্ধতিতে প্রতিরোধ করলে সুফল পেত নিশ্চয়ই।

এই বোধে উদ্বুদ্ধ বলেই গান্ধীজী বলেছেন, শত্রুর বিরুদ্ধে 'পোড়া মাটির নীতি' গ্রহণ করা অপরাধ। পালানোর সময় আমরা যদি কূয়োর জলে বিষ ফেলে যাই, আমাদের 'শত্রু-ভাই' সেই জল পান করে মারা যাবে। এতে বীরত্ব নেই, নেই উদারতা বা পবিত্রতাও।[১২৩]

মানুষকে মহত্তর রূপে দেখতে ভালবাসতেন বলেই গান্ধীজী চেয়েছিলেন তার নৈতিক জীবন। সেই জীবন ত্যাগ, সারল্য ও উদারতায় সমৃদ্ধ। তাঁর মতে, মানুষকে সংযম পালন করতে হবে, কামনায় ও জীবন-যাপনে। সেইজন্য তাঁর আদর্শ-সমাজে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। প্রাচুর্য্যও সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত। মানুষ স্বেচ্ছায় তার জীবন যাত্রার-মান নিয়ন্ত্রণ করবে, আদিম কালের সারল্যে তার দৈনন্দিন-জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে।[১২৪]

মানুষের চরিত্র-সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণা বড় বেশী আশাব্যঞ্জক। মনে হয়, অতি-সরলীকরণের মাধ্যমে তিনি সব সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। সেই জন্যই তাঁর দর্শন বাস্তবের নয়, শিক্ষাগত চর্চ্চারই বিষয়বস্তু।[১২৫]

এই গান্ধীজীর বিরুদ্ধেই সুভাষ নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন। অভিযোগ তুলেছেন পশ্চাদবর্ত্তীতার। গান্ধীজীকে তাঁর মনে হয়েছে, এক প্রাচীনপন্থী, ইতিহাস-অজ্ঞ, কল্পনাবিলাসী দার্শনিক বলে; যাঁর কাছে লক্ষ্য আর পথ অভিন্ন, হিংসা সর্বথা পরিত্যাজ্য।[১২৬] সব চাইতে বড় কথা—জীবনত্যাগ তো বটেই, দরকার হলে, শত্রুকে ভালবেসে সব দেওয়া যায়। পৃথিবীর জন্য দেওয়া যায় স্বদেশও।[১২৭]

বলা বাহুল্য, সুভাষ এত উচ্চাঙ্গের দর্শনে বিশ্বাসী নন।

তিনি বাস্তববাদী দেশনেতা। সেই জন্যই তিনি দুশো বছরের শোষিত মানুষকে আত্ম-সংযম আর সরল জীবনের দর্শন শোনাতে পারেন না। তিনি চান তাদের আর্থিক মুক্তি আর সমৃদ্ধি, আর সে জন্য চাই প্রয়োজনীয় নীতি-নির্দ্ধারণ। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে তিনি দেশের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে চান। সেই জন্যই, তাঁর মতে, দরকার সত্যিকার শিল্প-বিপ্লব। খুব ভাল হয়, সেটা যদি তুরস্ক বা রাশিয়ার মতো দ্রুত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ঘটে। কৃষিতেও তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগের পক্ষপাতী। আর দরকার জনসংখ্যা-সংক্রান্ত একটা নীতি, জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও

(হরিপুরা বক্তৃতা)। দেশরক্ষা এবং সমৃদ্ধির জন্য তিনি একটা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চেয়েছেন, স্বল্প সময়ের জন্য যা তুরস্কের ধাঁচে আধা-একনায়কতান্ত্রিক হবে।[১২৮]

সুভাষ জাতীয়তায় বিশ্বাসী। কিন্তু তার ভিত্তি দেশপ্রীতি। অথচ স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মনে করেন, সেই জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিকতাবোধে উন্নীত হবে।[১২৯] তিনি গান্ধীজীর মতো বিশ্ব-শিক্ষক নন বলেই পৃথিবীর জন্য তিনি দেশকে বিসর্জন দিতে পারেন না।

তেমনি তিনি গান্ধীজীর প্রিয় প্রাচীন যুগের বর্ণাশ্রমও পছন্দ করেন নি। গান্ধীজী চেয়েছেন, শ্রেণী-সমন্বয়। তিনি মালিক-শ্রমিক, জমিদার-কৃষক, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-হরিজন সবাইকে মিলিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন।[১৩০] কিন্তু সুভাষ জানেন, কৃত্রিম ঐক্যে কোথাও জোড়া লাগে না। তিনি জানতেন, একদিন না-একদিন গান্ধীজীর এই সমন্বয়ী বন্ধন ভেঙে পড়বে। তাঁকে ঠিক করে নিতে হবে, তিনি কার সঙ্গে থাকবেন—মালিকের সঙ্গে, নাকি বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে?[১৩১]

সুভাষ শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী বলেই তিনি জমিদারী-প্রথাকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন কোনো আপোষ ছাড়াই। কৈশোরেই তিনি বুঝেছিলেন যে, সব দেশেই এই সামন্ততন্ত্র দেশের মুক্তির পক্ষে এক প্রবল বাধা।[১৩২] তিনি যে আধুনিক ভারত-রাষ্ট্রের রূপরেখার কথা ভাবতেন, সেখানেও জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সেটা বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব।[১৩৩] বম্বে-ভাষণে তিনি বলেছেন, বিপ্লবের ফলে হয়ত রক্তপাতও হবে। শরীরের প্রয়োজনে যেমন অস্ত্রোপচার দরকার হয়, জাতীয় স্বার্থে তেমনি প্রয়োজন হতে পারে সুবিধাবাদী শ্রেণীর অবলুপ্তি।[১৩৪] সুতরাং সুভাষ হৃদয়-পরিবর্তনের দার্শনিকতায় বিশ্বাসী নন। অহিংসা তাঁর কাছে কোনো ধর্ম নয়, কাজ-চালানোর নীতি-মাত্র। তাঁর কাছে

হিংসা-অহিংসাটা বড় কথা কোনোদিনই ছিল না, লক্ষ্যটাই বড় কথা। গান্ধীজীর কাছে অবশ্য লক্ষ্য আর পথ অভিন্ন, দুটোই মহৎ হওয়া দরকার।[১৩৫] কিন্তু সুভাষচন্দ্র পথ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী, তাঁর কাছে অবস্থা-অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেই-জন্য তিনি যুদ্ধকে অবিমিশ্র পাপ মনে করেন না। তাঁর মতে পদানত দেশের পক্ষে যুদ্ধের প্রয়োজন থাকতে পারে।[১৩৬] বিশেষ করে, ইংরেজের সঙ্গে গান্ধীজীর আপোষের নীতি সুভাষের একেবারে অপছন্দ। তিনি চেয়েছেন সামগ্রিক সংগ্রাম, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ওরা এদেশ না ছেড়ে যায়। এই ব্যাপারে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই, ক্লান্তি নেই। কারণ, তিনি জানেন, ইংরেজ একটা ভাষাই বোঝে—তা হল আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত।[১৩৭]

এই সুভাষের সঙ্গে গান্ধীজীর পথ আলাদা হতে বাধ্য।

॥ ছয় ॥

এবার তাই মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। কলকাতা কংগ্রেসে সেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সামরিক সাজে সাজিয়ে অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র অভ্যর্থনা জানালেন সবাইকে। সেদিন তাঁর দুচোখে পরবর্ত্তী কালের আজাদ হিন্দের স্বপ্ন ছিল কিনা জানি না, কিন্তু শান্তিপ্রিয় গান্ধী-বাদীরা খদ্দরের বদলে ইউনিফর্ম দেখে, সুভাষের কম্বুকণ্ঠে রামধুন সঙ্গীতের বদলে 'ভয়ালিটিয়ার্স ফল-ইন্' শুনে চিড়িয়াখানা দেখার রঙ্গে বা ব্যঙ্গে হয়ত উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজী নিজেই বলেছিলেন: এটা পার্ক্ সার্কাসের সার্কাস।

কিন্তু তখনো বাকি ছিল।

গান্ধীজীর প্রিয় ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের বদলে সুভাষ চাইলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। বিরোধ অনিবার্য্য হয়ে উঠল।

আসলে গান্ধীজী বৃটেনের সম্পর্কশূন্য স্বাধীনতা কোনোদিনই চা'ন নি। যখনি পূর্ণ স্বাধীনতার কথা উঠেছে, তিনি বাধা দিয়েছেন। হজরৎ মোহানী বারবার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলেছেন, কিন্তু গান্ধীপন্থীদের বিরোধিতায় সেটা ভেস্তে গেছে শেষ পর্য্যন্ত। গান্ধীজীর মতে, এটা যুক্তিহীনতা ('lack of reason')। গৌহাটি কংগ্রেসেও এই ধরণের প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। গান্ধী জানিয়েছেন, এটা কংগ্রেসের সুস্থতারই লক্ষণ। তাঁর মতে, এ-ধরণের প্রস্তাব বৃটেনের প্রতি আস্থার অভাবই সূচীত করে। যারা এগুলো তোলেন তাঁরা ভাবেন যে, ইংরেজ কোনোদিন সুবিচার করবে না।[১৩৮] ১৯২৭ সালে তবু মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে গান্ধীর অনুপস্থিতিতেই। তিনি স্বভাবতঃই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন তাতে। বলেছেন, এটা অতি-দ্রুততা আর চিন্তাহীনতারই ফল।[১৩৯]

অথচ, এক বছরের মধ্যেই আবার উঠল পুরণো প্রস্তাব—ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস। সুভাষ-নেহরু পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব তুললেন দ্বিধাহীন চিত্তে। সুকৌশলী গান্ধীজী এবার রণনীতি পাল্টে প্রস্তাব তুললেন, বৃটিশ যদি এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস না দেয়, তবে পূর্ণ-স্বাধীনতার লক্ষ্যই কংগ্রেস গ্রহণ করবে। সুভাষ এবং তরুণদের এক সংশোধনী প্রস্তাব ১৩৫০-৯৭৩ ভোটে বাতিল হয়ে গেল। সুভাষ অবশ্য লিখেছেন যে, ভোটটা মুক্ত আবহাওয়ায় হয় নি। গান্ধীবাদীরা প্রচার করেছিলেন যে, গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত না হলে তিনি কংগ্রেস থেকে বিদায় নেবেন, সদস্যরা গান্ধীজীকে ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলেই পূর্ণ স্বাধীনতা-প্রস্তাব গ্রহণ করানো যায় নি। পছন্দমতো প্রস্তাব গ্রহণের জন্য তিনি অনশন অথবা কংগ্রেস থেকে বিদায়-গ্রহণের কথা বলে চাপ সৃষ্টি করতেন।[১৪০]

অথচ সুভাষ তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে যখন নির্দ্বিধায় উঠে দাঁড়িয়েছেন, তখনো বয়োঃজ্যেষ্ঠ নেতাদের প্রতি তাঁর বিনীত

শ্রদ্ধানিবেদন ছিল। তিনি শুধু প্রশ্ন করেছিলেন: আপনারা বৃটিশকে বারো মাসের সময় দিয়েছেন। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন, কেউ আপনারা বিশ্বাস করেন যে, এই সময়ের মধ্যে ওরা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেবে? মতিলাল স্বীকার করেছেন যে, তিনি করেন না। তাহলে পতাকা নামাচ্ছেন কেন? কেন বলছেন না, আমাদের আর ইংরেজের ওপর কোনো ভরসা নেই, এবার বলিষ্ঠভাবে আমরা নতুন পথে চলব?[১৪১] এইখানেই তিনি ভবিষ্যৎবক্তার মতো বলেছিলেন যে, বিশ্বযুদ্ধ বাধবেই, সেই পরিস্থিতির সুযোগ আমাদের নিতে হবে। মহাযুদ্ধের এগারো বছর আগেই সেই দূরাগত মহাপ্রলয়ের ছবি ভেসে উঠেছিল একত্রিশ বছর বয়সের তরুণের চোখের সামনে। কিন্তু প্রবীণরা সেই দূরদৃষ্টির দাম দিলেন না কিছুতেই।

১৯২৯ সালের ৩১শে আগস্ট বড়লাট আরউইন জানালেন যে, ভারতবর্ষকে ডোমনিয়নের মর্য্যাদা দিতে বৃটেনের কোনো নীতিগত আপত্তি নেই। নেতাদের আর আনন্দের অবধি রইল না। নভেম্বরে দিল্লীতে সর্বভারতীয় নেতাদের স্বাক্ষরযুক্ত একটা স্মারকলিপি বড়লাটকে পাঠানো হল। বলা হল, প্রতিশ্রুত গোলটেবিল বৈঠকে যেন ডোমিনিয়ানের উপযোগী একটা ভারতীয় সংবিধান-রচনার পরিকল্পনা করা হয় এবং তার আগে কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের একটা সন্ধি-চুক্তি রচিত হয়। সুভাষচন্দ্র, কিচ্‌লু আর আব্দুল বারি স্বাক্ষর দিতে রাজী হলেন না। পূর্ণ স্বাধীনতার অন্যতম দাবিদার জবাহরলাল প্রথমে রাজী না হয়েও গান্ধীজীর চাপের কাছে নতি-স্বীকার করলেন। অবশ্য চিরদিনের অস্থিরচিত্ত জবাহরলাল স্বাক্ষরের পরেও মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন।[১৪২]

কিন্তু বড়লাট নেতাদের হতাশ করে দিলেন। তিনি কোনো প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় শূন্য হাতে নেতৃবৃন্দ ফিরে এলেন। গান্ধী জানালেন, এবার তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। সেই অনুসারে লাহোরে এই প্রস্তাব গৃহীত হল। ৩১শে ডিসেম্বর (১৯২৯) রাষ্ট্রপতি জবাহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তুললেন।

আবার উঠে দাঁড়াতে হয়েছে সুভাষকে। কংগ্রেস স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়েছে বটে, কিন্তু তা অর্জন করার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হয় নি। বরং বয়কট প্রভৃতি পুরানো পদ্ধতিতেই অটুট রাখা হয়েছিল। সুভাষ একটা প্রস্তাবে পাল্টা সরকার গঠন করার এবং সেই জন্য কৃষক-শ্রমিক-যুবকের সমন্বয়ে কংগ্রেসকে গণপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। কিন্তু, বলা বাহুল্য, তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয় নি।[১৪৩]

এই অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, জবাহরলালকে ভিড়িয়ে নিয়ে তিনি শক্তি-বৃদ্ধি করলেন। ওয়াকিং কমিটি গঠিত হল গান্ধীজীর প্রিয়পাত্রদের নিয়ে। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতাদের ওয়াকিং কমিটিতে রাখার জন্য যদিও প্রচণ্ড দাবি উঠেছিল, গান্ধীজী নতি-স্বীকার করলেন না। সুভাষচন্দ্রকে না নেওয়াতে কংগ্রেসের এক শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হল। আব্দুল রহিম জানালেন, সুভাষচন্দ্রকে বাদ দিয়ে একটা ওয়াকিং কমিটির কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। অনেক সদস্যই তখন হর্ষধ্বনি করেছেন।[১৪৪] সুভাষচন্দ্র-সহ বাষট্টিজন ক্ষুব্ধ সদস্য সভাস্থল থেকে বেরিয়ে এলেন। গড়ে উঠল কংগ্রেস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। আয়েঙ্গার সভাপতি, সম্পাদক হলেন সুভাষ।

গান্ধীজী কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করে ফেললেন। দেশের তারুণ্যশক্তিকে বশে রাখতে হবে, যৌবনের যাতে দৃপ্ত বহিঃপ্রকাশ না ঘটে, একটা আন্দোলন—অবশ্যই অহিংস ও নিষ্ক্রিয়—গড়ে তুলতে হবে অবিলম্বে। এণ্ড্রুজকে সিদ্ধান্তটা জানিয়েও দিলেন [১৪৫]

অবশ্য ইতিমধ্যে গান্ধীজী তাঁর যোগ্য কাজই করেছেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার'র মাধ্যমে তিনি সেই পুরোণো ধাঁচের আপোষ চাইলেন, ঘুরে ফিরে এল স্বরাজের কথা। যিনি কিছুদিন আগে নিজেই লাহোরে স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলেছেন, তিনি কি করে আকস্মিকভাবে সরে এলেন আবার, সেটাই বোঝা দরকার। ঈশ্বরীপ্রসাদ মন্তব্য

করেছেন, যাঁরা সাধারণ মানুষ, সাধুসন্ত নন—তাঁরা গান্ধীর আচরণে সামঞ্জস্য খুঁজে পাবেন না কিছুতেই।[১৪৬]

॥ সাত ॥

অনেক সম্ভাবনা আর উদ্দীপণা নিয়ে এল নতুন বছর।

ডাণ্ডী-অভিযান দিয়ে গান্ধীজী আন্দোলন শুরু করেছেন। এই শুরুর তুলনা নেই। এমন প্রতীকী পদক্ষেপ গান্ধীজীই নিতে পারেন। সমগ্র দেশ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সমস্ত মানুষ এগিয়ে এসেছে রণসাজে। তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্ব এই আন্দোলনকে উত্তেজনার তুঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে।[১৪৭] এটাই ছিল স্বাভাবিক। তিনি কংগ্রেসকে দিয়েছেন ব্যাপ্তি, আন্দোলনে এনেছেন জনগণের সামগ্রিক জাগরণ।[১৪৮]

দেখতে দেখতে প্রাণের জোয়ার এল। বন্দীর সংখ্যা দাঁড়াল ষাট হাজার।[১৪৯] কিন্তু এবারেও সেই একই ইতিহাস। গান্ধীর সঙ্গে বড়লাটের চুক্তি হয়ে গেল। দেখা গেল, পূর্ণ-স্বাধীনতার কথা চুক্তি-পত্রে নেই। গান্ধী বিলেত যাবেন গোল-টেবিল বৈঠকে। অহিংস আন্দোলনের বন্দীরা মুক্তি পাবেন, পুলিশী বাড়াবাড়ির ব্যাপারটা বড়লাট দেখবেন।

গান্ধীজীর আন্দোলনে এক বিচিত্র বৈপরীত্য রয়েছে। তাঁর শুরুর সঙ্গে শেষের মিল নেই, প্রথম উত্তেজনার পর আপোষ আর আত্মসমর্পণ ঘটে, বিভ্রান্তি ওঠে চরমে।[১৫০] আসলে তিনি আন্দোলনকে চরমে উঠতে দেন না কখনো। মাঝে মাঝে সংগ্রাম থামিয়ে প্রমাণ করেন যে, পবিত্র সত্যাগ্রহের চাইতে তাঁর কাছে স্বরাজ বড় নয়।[১৫১]

সুভাষ জেল থেকে বেরিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে বোম্বে গেলেন। সেখান থেকে দিল্লী এবং করাচি। গান্ধীজী কথা দিলেন, গোল-

টেবিল বৈঠকে স্বাধীনতার আদর্শের পরিপন্থী কিছু করা হবে না। অথচ করাচী কংগ্রেসে আবার ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের লক্ষ্যই ঘোষিত হল।

তার চাইতে বড় কথা, দিল্লী পেঁছে তাঁরা জেনেছেন, সরকার ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসী দেবেন ঠিক করেছেন (তাঁরা কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা ফাটিয়েছিলেন। কেউ নিহত হয় নি। এঁরা শুধু চেয়েছেন কালাকে সশব্দে কিছু শোনাতে)। সুভাষ গান্ধীজীকে পরামর্শ দিলেন, এই ব্যাপারে বড়লাটের ওপর চাপসৃষ্টি করার জন্য। দরকার হয়, এর জন্য চুক্তি ভেঙে দিতে হবে। কিন্তু চুক্তি রইল, বন্দীরা শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন। করাচীতে গান্ধীজী নামতেই একদল যুবক তাঁকে কালো ফুলের মালা পরিয়ে দিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে, গান্ধীজী শহীদদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন নি। গান্ধীজী নিজেই লিখেছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি বন্দীদের মুক্তিকে চুক্তির সর্ত্ত হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেন নি, তাই শুধু ব্যাপারটা তুলেছিলেন।[১৫২] আর বড়লাট আরউইন মন্তব্য করেছেন যে, তিনি তাঁর অসহায়তার কথা গান্ধীজীকে বলেছিলেন, তিনি সেটা বুঝেছেনও।[১৫৩] সে যাই হোক, এই ব্যাপারে গান্ধীজীর অনীহাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশ্যই তিনি ব্যাপারটা শক্ত হাতে ধরতে পারতেন।[১৫৪]

তবে করাচী কংগ্রেসে ভগৎ সিং প্রভৃতির আত্মবলিদানের প্রশংসা করে প্রস্তাব তোলা হয়েছিল। গান্ধীবাদীরা আপত্তি তুলেছিলেন সত্যি, কিন্তু প্রস্তাবটা গৃহীত হয়েছিল, গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, শহীদদের ব্যাপারটাতে তিনি ভুল করেছেন।

ভুল করেছেন তিনি ইংলণ্ডেও। বৃটিশের চালে তাঁকে কতগুলো মতলববাজ, স্বার্থান্বেষী ভারতীয়ের সঙ্গে গোলটেবিলে বসতে হল। কোণঠাসা অবস্থায় তিনি তাঁর অসহায়-অবস্থা বুঝলেন। করুণ কণ্ঠে শেষে আবেদন রাখলেন, এই বৃদ্ধকে এবার তোমাদের হৃদয়ে

একটু স্থান দাও, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটু বাঁচতে দাও। বাষট্টি বছরের এই দুর্বল বৃদ্ধ আবেদন করছি, আমাকে আর আমার প্রতিষ্ঠানকে তোমাদের হৃদয়ে একটু স্থান দাও।[১৫৫]

ইংরেজের কূটচালে গান্ধীজীর আবেদন অরণ্যে রোদন হল। বিশপ-আর্চবিশপ-দার্শনিক-অধ্যাপকদের সভায় তিনি বিশ্বসমস্যা, প্রেম, ও মৈত্রী নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন। তাঁর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাইর পত্রে জানা গেল এতেও তাঁকে অনেক সময় দিতে হয়েছে। সুভাষ লিখেছেন— পাগল অধ্যাপক আর পাদ্রীদের মধ্যে সময় নষ্ট করে গান্ধীজী অবশেষে শূন্য হাতে ফিরে এলেন।

এবার রুদ্ররূপ নিল ইংরেজ। গান্ধীজী বোম্বেতে নামতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা। নেতাদের বাদ দিয়েই নব্বই হাজার লোক ধৃত হলেন। প্রহার-পীড়ণ, নারী নিগ্রহ, শ্লীলতাহানি, ধর্ষন, জেলখানায় প্রহার, ল্যাট্রিন্-প্যারেড, গণগ্রেপ্তার, বন্দীদের ওপর গুলী চালানো, ডাণ্ডাবেড়ী, নির্জন সেলে নির্বাসন—সব মিলিয়ে জার্মানীর নাৎসীদের অপকর্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৫৬] এই অত্যাচার অবশ্য মানুষের প্রতিরোধ শক্তিকে যখন বাড়িয়ে তুলেছে, গান্ধীজী আবার সেই পুরানো খেলা দেখালেন। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার প্রতিবাদে হঠাৎ অনশনের হুমকী দিলেন।

এর ফলে আইন-অমান্য চাপা পড়ে গেল। গান্ধীজীর জীবন রক্ষার প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে সমঝোতা হল সত্যি, কিন্তু এতে ভারতবাসীর বিভেদটা প্রকট হয়ে উঠল। আর তার কিছুদিন পরে গান্ধীজী দ্বিতীয়বার অনশন করলেন আত্মশুদ্ধি এবং হরিজনদের কল্যাণের জন্য। আইন-অমান্য ছয় সপ্তাহের জন্য মুলতুবী রইল এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাহৃত হল প্রত্যাশিত পন্থাতেই।

বিদেশে-নির্বাসিত সুভাষ এবার বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে বললেন, গান্ধীজী চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এবার দরকার নতুন নেতৃত্ব, নয়ত নতুন দল। সমালোচনা কংগ্রেসের ভেতরে আরো হয়েছে। বিশেষ করে, নেহরু পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তবে সব চাইতে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ন্যরীম্যানের কণ্ঠ। গান্ধীজী যখন পরাজিত সেনাপতির ভূমিকায় বারবার বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আবেদন করে ব্যর্থ হচ্ছেন, ন্যরীম্যান প্রশ্ন করেছেন, এটা সাক্ষাৎ-কার, না মৃত্যু? তাঁর মনে হয়েছে, আন্দোলন চুলোয় গেছে, মূল বিষয় দাঁড়িয়েছে—বড়লাট দেখা করবেন, কি করবেন না। তিনি জানতে চেয়েছেন, গান্ধীজীর এই অসংশোধনীয় মনোভাবের প্রতিশেধক কোথায়? কতদিন চলবে রাজনীতি আর ধর্মের এই জগাখিচুড়ি আর তার ছেদহীন পরিক্রমা? উত্তর একটাই। ন্যরীম্যান বলেছেনঃ গান্ধীজীর চারপাশ ঘিরে ওই যে ভৈরবীচক্র, স্বাধীন সত্তাহীন কতগুলো কলের পুতুল, ওদের স্থানে যদি একজন কাজের মানুষ পাওয়া যায়, তবেই মুক্তির উপায় আছে।

সেই মানুষ গান্ধীচক্রে পাওয়া যায় নি, তবে ন্যরীম্যানকে এই বিরুদ্ধতার দাম দিতে হয়েছে। বম্বে-কংগ্রেসের সভাপতিত্ব হারাতে হল তাঁকে, ১৯৩৭ সালের মন্ত্রীত্বও তাঁর কপালে জোটে নি। তাঁর দেশসেবার পথে নেমে এল কালো যবনিকা।[১৫৭]

তবে কি গান্ধীজীর সমালোচনা করাও যাবে না?

না, সেটা অমার্জনীয় অপরাধ। সব চাইতে বড় কথা, তিনি ভুল করতে পারেন না; স্বাভাবিক মানদণ্ডে তাঁর কাজের বা নীতির বিচারও চলতে পারে না। গান্ধীজী এতদিনে অবতারের পর্য্যায়ে পৌঁছেছেন। তাঁর কণ্ঠে দৈববাণী। তিনি চলেন ঈশ্বরের নির্দেশে। অন্তরের আলোয়। চৌরীচৌরার সময়ে গান্ধীজী নিজেই বলেছিলেনঃ God Clearly spoke to me.' তারপরেও আন্দোলনের দিনক্ষণ,

অনশনের সময়-নির্দ্ধারিত হয়েছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশেই। পট্টভীও জানিয়েছেন যে, যুক্তি-তর্ক নয়, গান্ধীজী চলেন অন্তরের আলোতে অন্ধকারে এতেই তিনি নিশানা খুঁজে পেতেন।[১৫৮] নেহরুও বলেছেন অনুরূপ কথা। গান্ধীজীকে স্বাভাবিক মানদণ্ডে বিচার করা উচিত হবে না।[১৫৯]

গান্ধীজী তাঁর লক্ষ্য জানেন না, শুধু জানেন পথ। এই পথই তাঁকে টেনে নিয়ে যায় অজানার উদ্দেশ্যে।[১৬০] তাঁর ঈশ্বরই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন।

এখানেই সুভাষের আপত্তি। আশৈশব যুক্তিবাদে দীক্ষিত হয়ে, তিনি বোঝেন যে, নেতার কাছে লক্ষ্য ও পথ সুনির্দিষ্ট হবে। অন্তরের আলোর কথা অর্থহীন, অবতারবাদ এক্ষেত্রে অচল। নেতাকে লক্ষ্য ও উপায় স্থির করতে হবে মননের আলোতেই।

॥ আট ॥

সুভাষের মনে হয়েছে, গান্ধীজী দেশকে অনেক দিয়েছেন, কিন্তু উনি বড্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী। দেশের স্বার্থকে ছাপিয়ে কতগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তাঁর জীবনে বড় হয়ে উঠেছে। সেইজন্য তিনি তাঁর কতগুলো তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন দেশের মানুষের মহত্তম মঙ্গলের কথা না ভেবেই। তাঁর কাছে দেশের স্বাধীনতার চাইতে অহিংসা বড়। অহিংসার মাধ্যমে যদি স্বাধীনতা আসে তো ভাল, না হলে তার দরকার নেই, অহিংসার আদর্শকেই আঁকড়ে থাকতে হবে।[১৬১]

এই আদর্শের ভিত্তিতেই তিনি ইংরেজের শুভবুদ্ধির প্রতীক্ষা করে-ছেন। চেয়েছেন আত্মনিপীড়নের মাধ্যমে ইংরেজের হৃদয়ের পরি-

বর্ত্তন। তাঁর এই হৃদয়-জয়ের প্রেরণা শুদ্ধিরই নামান্তর। কিন্তু একথা তাঁর মনে হয় নি যে, ইংরেজ—শুধু ইংরেজ কেন—কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই হৃদয় থাকে না। তাঁর আন্দোলনটাই এদেশের ইংরেজ-আমলাতন্ত্রের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি। আর স্বদেশে ইংরেজের হৃদয়ে একটা আলোড়ন হত যদি এদেশে ব্যাপক একটা আগ্নেয় আন্দোলন হত এবং পুলিশকে প্রচণ্ড চণ্ডরূপ গ্রহণ করতে হত তার মোকাবিলা করার জন্য।[১৬২]

সুভাষের বক্তব্য, গান্ধীজী মহৎ। কিন্তু ইংরেজ তাঁর মহত্ত্বের সুযোগ নিয়েছে। তাঁর সততাকে ব্যবহার করেছে নিজের স্বার্থে। আর তার ফলে এ-দেশের ক্ষাত্র-শক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।

গান্ধীজী ক্ষাত্র-শক্তিকে নির্বিষ করেছেন দুভাবে। প্রথমত, তিনি এদেশের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দৃপ্ত তারুণ্যকে বরাবরই সন্দেহ আর ঘৃণার চোখে দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, এঁরা দেশের শত্রু, তাই তাঁর বিরূপতার মাধ্যমে তিনি এঁদের আত্মনিবেদনের বিপুল আবেদনকেও নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছেন। সেইজন্য গোপীনাথ সাহার (যিনি টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ডে-কে আক্রমণ করেছিলেন) গৌরবময় মৃত্যু সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব গান্ধীজীকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। মাত্র আট ভোটে জয়লাভকে তিনি সম্মানের বলে মনে করেন নি। তাঁর 'ইয়াং ইণ্ডিয়া-তে নিজেকে 'humbled and defeated' হিসেবে ধিক্কার দিয়েছেন।[১৬৩] বীর-বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মাহুতিতে সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দিলেও গান্ধীজী দীর্ঘদিন নীরব ছিলেন। পরে জানিয়েছিলেন যে, ওটা ইচ্ছাকৃত মৃত্যু (diabolical suicide) মাত্র। তাই ইচ্ছে করেই তিনি এতদিন কিছু বলেন নি, বললে অপ্রিয় কথাই বলতে হত।[১৬৪] তিনি ভগৎ সিংয়ের স্মৃতিরক্ষা-কমিটিতেও থাকতে চান নি, কারণ তাতে তাঁর কার্য্যাবলীকে সমর্থন করা বোঝায়। তাঁর মতে, ভগৎ সিংহ সম্পর্কে উন্মাদনা দেশের

বিরাট ক্ষতি করেছে (the result is goondaism and degradation wherever this mad worship is being performed).

অথচ নিজে এই আগ্নেয় মৃত্যুযজ্ঞে না থেকেও, সুভাষ অগ্নিমন্ত্রের নির্ভিক যোদ্ধাদের প্রাণের ডালি দিয়েছেন চিরদিনই। হয়ত তিনি গুপ্ত হত্যাকে স্বাধীনতার সঠিক পথ বলে মনে করেন না, কিন্তু এই প্রাণশক্তিকেই ঐক্যবদ্ধ করে মহা-সংগ্রামের দিন গুনবেন বলেই কংগ্রেসের বিরাট মঞ্চকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। সেইজন্যই এই সব দীপ্ত তরুণের জীবন-মৃত্যুর অভীঃ-মন্ত্র তিনিও মনে মনে স্মরণ করেন। গোপীনাথের মৃত্যুতে তিনি শিশুর মতো কাঁদেন, যতীন দাসের মরদেহ নিয়ে তিনি পৌঁছে যান মহাশ্মশানে, ভগৎ সিংয়ের উদ্দেশ্যে জানান প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলী।[১৬৫]

এটাই তো স্বাভাবিক। সুভাষেরও মানসদীক্ষা বিবেকানন্দের কাছে। প্রথম যুগে তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাদের প্রাণের স্পন্দন ছুঁয়েছিল তাঁর হৃদয়তন্ত্রীকেও।[১৬৬] এই যোগাযোগ পরে বেড়েছে, চিত্তরঞ্জনের মাধ্যমে তিনি এই বিপ্লবীদের আরো কাছে এসেছেন অসহযোগের যুগে। পরবর্তী কালেও দেখা গেছে, এঁদের অনেকেই তাঁকে নেতৃপদে বরণ করেছেন, সমর্থন করেছেন বিভিন্ন নির্বাচনের সময়ে।[১৬৭] এদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা ও তার ব্যর্থতার কারণগুলো তিনি পর্য্যালোচনা করে এসেছেন বরাবর। তাই এ ব্যাপারে অন্যান্য কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে সুভাষের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। সেই পার্থক্যের জন্যই তিনি আসলে বিপ্লববাদী। সেইজন্যই তিনি ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব-সাধনার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ বিকাশ।[১৬৮]

বিপ্লববাদে বিশ্বাস ছিল বলেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীবাদী আন্দোলনের আপোষপন্থী স্বরূপকে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছে, গান্ধীবাদ অন্য একদিক থেকেও ক্ষাত্রশক্তিকে ধ্বংস করেছে। যখনই দেশে সংগ্রামের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, গান্ধীজী হয় আন্দোলন

থামিয়ে দিয়েছেন, আর না হয় আপোষের দিকে ঝুঁকেছেন। তিনি চেয়েছেন যাতে আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের বিতৃষ্ণা একটা প্রকাশের পথ পায়, অথচ সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর হাতের মুঠোয় থাকে।' আইন-অমান্য আন্দোলনের আগে বড়লাটকে তিনি যে চিঠি লেখেন, তাতে তাঁর এই মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৬৯] তাঁর অহিংস-আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুটো—প্রথমতঃ, হিংসাত্মক উগ্রতাকে বশে রাখা, আর দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশের চণ্ডনীতিকে সংযত করা। ইংরেজ তাই তাঁকে দেখেছে Reducer of violence' হিসেবেই।

সেইজন্যই তিনি দুটো আন্দোলনকে কিছুটা এগিয়ে তারপরই আপোষের পথ খুঁজেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ-শাসনকে অচল করে দেওয়া নয়, দর-কষাকষির শক্তি বাড়ানো। ইংরেজও জানত, গান্ধীজী বিপ্লব ঘটাতে দেবেন না, আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে দিয়ে সন্ধি-পত্রের জন্য প্রস্তুতি নেবেন।[১৭০]

অথচ তাঁর ডাকে আইন-অমান্য আন্দোলনে এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক জেলে গেছেন। মোটামুটি নিরস্ত্র থেকেও ইংরেজের ভয়াবহ অত্যাচারের শীকার হয়েছেন। শুধু এই আন্দোলনেই যে বীভৎস দমন-লীলা চলেছে তার বর্ণনা দিতে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে ছাপান্নটি পৃষ্ঠা ব্যয় করতে হয়েছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধাকে বাদ দেওয়া হয় নি। বন্দীদের ওপরেও গুলী চলেছে। সুতরাং একথা বলা চলে গান্ধীজীর আন্দোলন ভারতবাসীদের দিক থেকে অহিংস, ইংরেজের ক্ষেত্রে হিংসার চূড়ান্ত রূপ। কষ্টস্বীকার আর আত্মত্যাগের শপথে দেশ তৈরী ছিল, কিন্তু তৈরী ছিলেন না নেতা। অবশ্য বিদেশীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ বুঁজে মার খেয়েও তাদের ভালবাসার মন্ত্র দেশকে শেখানোর জন্য গান্ধীজী দার্শনিকের মর্য্যাদা পেয়েছেন, তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন—রাজনীতিবিদ থেকে তিনি চাইছেন সন্তে উন্নীত হতে।[১৭১]

তবু তাঁর ভয় এই ক্ষাত্র-শক্তিকেই। তারুণ্যের দুর্দমনীয় তেজ-কেই তিনি পরাভূত করতে চেয়েছেন বারবার। এতকাল তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেসকে একদল নৈষ্ঠীক খদ্দরধারীর কুক্ষিগত করতে, তার জন্য সদস্যপদের সর্ত্ত হিসেবে তাঁতবস্ত্র তৈরীর একটা ন্যূনতম পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন বহুবার। আইন-অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করলেন, কারণ কংগ্রেসে তখন সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রতিষ্ঠা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।[১১২]

গান্ধীজী বুঝেছিলেন, এই বামপন্থী শক্তির সঙ্গে তাঁকে একদিন মোকাবিলা করতে হবেই। চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন তিনি। কিন্তু নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে কাউকেই তিনি উপযুক্ত মনে করেন নি। তরুণ ভারত তখন চেয়ে আছে দুজনের দিকে—জবাহরলাল আর সুভাষ।

গান্ধীজী প্রথম জনকেই কাছে টানলেন। ১৯৩৬ সালের রাষ্ট্র-পতি হিসেবে বরণ করে নিলেন তাঁকে। অথচ রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, এণ্ড্রুজ প্রভৃতি মনীষী গান্ধীজীকে অনুরোধ করেছেন সুভাষকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য, বাংলার এই নির্বাসিত নায়ক তাহলে দেশে ফেরার একটা সুযোগ পাবেন।[১১৩]

কিন্তু গান্ধীজী তখন মোক্ষম চাল চেলেছেন। জবাহরলাল সেবার রাষ্ট্রপতি হয়ে কিভাবে গান্ধীজীর হাতের ক্রীড়নক হয়ে গেলেন সেকথা আগে বলেছি। কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশনে নেহরুকে আবার রাষ্ট্রপতি করা হল। গান্ধীজীর কৌশলে নেহরু দক্ষিণপন্থী শিবিরে নাম লেখালেন পাকাপাকি ভাবে। এতদিন তাত্ত্বিক পার্থক্য থাকলেও হৃদয়ের একটু বন্ধন ছিল। এবার যুক্ত হল উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমঝোতা।

তখনো কিন্তু সুভাষ হাল ছাড়েন নি। নেহরুকে তিনি টেনে রাখতে চেয়েছেন। ইতিমধ্যে ভারত-শাসন আইন-অনুসারে কংগ্রেস নির্বাচনে লড়ে গদী দখলের স্বপ্ন দেখছে। গান্ধীজীর আশীর্বাদে

আইনসভা-প্রবেশ লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। সুভাষ এই ক্ষমতা-লোভের রাজনীতিকে প্রতিহত করার জন্য নেহরুর সহায়তা চেয়েছেন। লিখেছেন—নিজেকে দুর্বল ভেব না, আদর্শ অনুযায়ীই কাজ করবে। তোমায় হারাতে হয়, এমন কাজ গান্ধীজী করবেন না কিছুতেই।[১৭৪]

কিন্তু নেহরুর কাছে আদর্শের চাইতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড়। তাই গান্ধী তাঁকে দলে পেয়েছেন চিরদিনের জন্য। এবার গান্ধীজীর লক্ষ্য সুভাষচন্দ্র। তাহলেই নিষ্কন্টক তিনি।

সেইজন্য ১৯৩৮ সালের হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষই রাষ্ট্রপতি।

।। দ্বিতীয় পর্ব ।।

। নয় ॥

হরিপুরাতে ভাষণ দেওয়ার সময় নেতা সুভাষচন্দ্র ঋষিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন হয়ত। বর্তমান আর ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে তাঁর সামনে যেন ধরা দিয়েছিল। তাঁর হরিপুরা-ভাষণ তাই রাজনৈতিক সাহিত্যে অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিৎ। এই ভাষণ সাহিত্যের নয়, রাজনীতির নয়—জীবনের সৃষ্টি, বেয়াল্লিশ বছরের এক আশ্চর্য প্রেমিক-প্রতিভার মহাদান।[১৭৫] সত্যি কথা বলতে গেলে, এই ভাষণ সুভাষের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, প্রখর ইতিহাস-চেতনা, আধুনিক অর্থনীতির ধারণা, আন্তর্জাতিকতা-বোধ আর ভবিষ্যৎ-প্রজ্ঞাদৃষ্টির স্বকীয়তায় অসামান্য মূল্যের অধি-কারী। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেসের কোনো সভাপতির ভাষণের সঙ্গে এর তুলনাই চলে না।[১৭৬]

সুভাষচন্দ্র দুই কাল-ভূখণ্ডে পা দিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছেন—স্বাধীনতার পূর্বের ভারত আর স্বাধীনতা-উত্তর ভারত এই একটি ভাষণের যোগসূত্রে অচ্ছেদ্য রয়ে গেছে। নবীন নায়কের কণ্ঠে সেদিন বেজেছিল বিরাটের মহাসঙ্গীত—আমরা শুধু ভারতবর্ষের জন্যই সংগ্রাম করছি না, আমাদের সংগ্রাম মানবতার জন্যও। ভারতের মুক্তি মানবতার মুক্তিরই একটা পদক্ষেপ।

সুভাষের ভাষণকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—স্বাধীনতা-লাভের সমস্যা আর নবীন ভারতের রূপায়ণের পথনির্দেশ।

প্রথমেই সুভাষচন্দ্র জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। কালের অঙ্গুলি তুলে তিনি দেখালেন, তিনি শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপকে—বৃটেনকেও সেই অমোঘ নিয়মেই স্থান করে নিতে হবে সেখানে। এমনি করেই তো ভেঙে পড়েছে একদিনের রোম সাম্রাজ্য, তুর্কী,

অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীর বিশাল সৃষ্টি, দুর্দ্ধর্ষ জয়ের বিপুল প্রাধান্য। বিশেষ করে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের এখন অন্তিম দশা। তার সাম্রাজ্যটাই এক বিচিত্র বৈপরীত্যের উদাহরণ। এই আভ্যন্তরীণ সংকটই শেষের সেদিন ঘনিয়ে আনবে। আর বৃটেন যদি তার উপনিবেশগুলোকে নিয়ে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে একটা যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলে, তার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়বে অর্থনৈতিক কারণেই। বৃটেনের ধনিক-সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে উপনিবেশবাদের ওপরেই, এর অবসান সমাজতন্ত্রই ডেকে আনবে। সেইজন্যই আমাদের সংগ্রাম শুধু ভারত-মুক্তির জন্য নয়, বৃটেনের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যও।

মনে রাখতে হবে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই নানা জটিলতা রয়েছে। এর একদিকে আয়ারল্যাণ্ড, মাঝে প্যালেষ্টাইন, ইরাক, ইরাণ আর একেবারে পূবে ভারত। তাই এর গঠনের দিক থেকেই দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে। আর বাইরে তেমনি রয়েছে ইটালী আর জাপানের চাপ। রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া। এই অবস্থায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ টিঁকবে কতকাল?

বৃটেনের শক্তির মূল উৎস অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ছিল তার নৌ-শক্তি। কিন্তু বর্তমান যুগে বিমানবাহিনী সামরিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। দূরত্ব গেছে ঘুঁচে, লণ্ডনে এখন য়ুরোপের যে-কোন কেন্দ্র থেকে বিমান-হানা দেওয়া যায়।[১১] এর ফলে শক্তি-সাম্যে নতুন অবস্থা দেখা দিয়েছে। বিশালকায় সাম্রাজ্য-দৈত্য মাটির পা নিয়ে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এখন।

এই অবস্থায় আত্মবিশ্বাস নিয়েই আমাদেরকে সংগ্রামে ব্রতী হতে হবে। শুরু করতে হবে সত্যাগ্রহ। তাতে থাকবে আইন-অমান্যের সূচী। তা অহিংস হতে পারে, কিন্তু তাতে চাই সক্রিয় প্রতিরোধ পরিকল্পনা।

সুভাষ মনে করিয়ে দিয়েছেন, সব সাম্রাজ্যই বিভেদ-নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আর এই ব্যাপারে বৃটেন শঠ-শিরোমণি।

ওরা যেখান থেকে গেছে, দেশভাগ করে গেছে—যেমন আঁয়ারল্যাণ্ডে, প্যালেস্টাইনে। এটা ওদের নিজেদের সুবিধের জন্য দরকার। বৃটিশ এদেশেও চেষ্টা করবে তেমনি করে দেশকে খণ্ডিত করার জন্য, এই প্রচেষ্টাকে রুখতেই হবে।

এ যেন এক দৈববাণী। সেদিনের তরুণ নায়ক জাতির সামনে যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, নেতারা সেটা শুনেও শোনেন নি। ইতিহাসের ধারাকে অস্বীকার করে তাঁরা দেশে রক্তের নদীকেই পথ করে দিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ পরবর্ত্তী কালে স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টি করে কোনো লাভ হয় নি।[১৮]

সুভাষ বলেছেন, দেশের সংখ্যালঘু-সমস্যাটা সত্যিই গুরুতর। এই বিষয়ে কংগ্রেসকে সচেতন হতে হবে। বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, সংখ্যালঘুদের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগীতা নিয়েই মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কংগ্রেস-দল সম্পর্কে তিনি বলেছেন, স্বাধীনতার পরে দলকে ভেঙে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যারা স্বাধীনতা মানবে, স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিতে হবে তাদেরকেই। তা না হলে এখানে দেখা দেবে চূড়ান্ত বিশৃখলা।

গণতন্ত্রের রক্ষাকবচের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ভারতে কর্ত্তৃত্ববাদী একদলীয় ব্যবস্থা আসবে না। প্রথমতঃ, অন্য দলও থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গঠন গণতান্ত্রিক। এখানে ওপর থেকে নেতাকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না, নেতা আসবেন জনসাধারণের পছন্দ-অনুসারে, নীচের মহল থেকেই।

কংগ্রেসের ভেতর সোস্যালিষ্ট পার্টির অভ্যুদয়কে সুভাষ শুভ-লক্ষণ বলেই মনে করেছেন। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র এই রকম দলের অস্তিত্ব-বিরোধী নয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমাজতন্ত্রকে সফল করার জন্য এখনই সমাজতান্ত্রিক প্রচারণার প্রয়োজন আছে। তাঁর মতে, ভবিষ্যৎ ভারতে have-nots-দের জন্য haves-দের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে হবে, এছাড়া উপায় নেই কোনো।

প্রশ্ন হল : কংগ্রেস কিষাণসভা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতিকে অনুমোদন দেবে কিনা। সুভাষের বক্তব্য, এদেরকে সঙ্গে রাখতেই হবে। এরা ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই উদ্ভূত, আমাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের সম্মান দেবার এদের কোনো দায় নেই। এদের অর্থনৈতিক অধিকার মেনে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বৃহত্তর ক্ষেত্রে এদের সহযোগীতাকে গ্রহণ করতেই হবে।

স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠনের প্রশ্নেও সুভাষ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা—দুটোই রয়েছে। দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি আত্মত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন। আর চেয়েছেন বিভিন্নভাবে যেন একটা অখণ্ড ভারতীয়বোধ জেগে ওঠে মানুষের মনে। সেইজন্য সুষ্ঠু শিক্ষণ-বিষয়ক পরিকল্পনা চাই, চাই স্থানীয় সংস্কৃতির উপযুক্ত বিকাশ। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটাও ভাবতে হবে। তাঁর মতে, হিন্দুস্থানী ভাষাকে রোমান হরফে গ্রহণ করলেই সমস্যাটার সমাধান হয়। এতে হিন্দীর উৎকট অভিযান যেমন রুদ্ধ হবে, তেমনি যোগাযোগ থাকবে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গেও।

সুভাষের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে ছিল—জন্মসংখ্যা-সমস্যা, ভূমিব্যবস্থা এবং শিল্প।

সুভাষচন্দ্র জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। ভারতে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হয়েছে কিনা এই অর্থনৈতিক কূটতর্কে না গিয়েও তিনি বলেছেন, ভারতের বর্ত্তমান দারিদ্র দূর করতে গেলে জনসংখ্যা সম্বন্ধে পরিকল্পনা তৈরী করতেই হবে। যদি জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে, তাহলে আমাদের সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি পন্থাটা বলে দেন নি বটে, কিন্তু জানিয়েছেন জনসাধারণকে এটা নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে।

তিনি ভূমি সমস্যার মর্মমূলেও আঘাত হানতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংশোধন দরকার। জমিদারীপ্রথার

উচ্ছেদ, কৃষকের পুরানো ঋণ-মকুব, অল্প-সুদে ঋণ-দান, সমবায়ের প্রসার, চাষের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন প্রভৃতি তাঁর কৃষি-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু শুধু কৃষি-সমস্যার সমাধানে হবে না। দেশে নতুন শিল্প-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বৃটিশ-শাসনে আমাদের শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এক শিল্পায়ন-ব্যবস্থা দরকার। যতই আমরা আধুনিক শিল্পায়নের নিন্দা করি না কেন, আমরা প্রাক্-শিল্প-যুগে ফিরে যেতে পারি না। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হবে বৃহৎ শিল্প-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি হ্রাস করে তাকে সংশোধিত রূপে গ্রহণ করা। এর সঙ্গে কুটীর শিল্পও থাকবে—বিশেষ করে কৃষির সংঙ্গে যুক্ত হস্তশিল্প।

এর পরে তিনি স্বাধীনভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক আদর্শের কথাও উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষ কোনো রাষ্ট্রের রাজ-নীতি-দ্বারা প্রভাবিত হবে না। ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রের পথে—যা তার নিজস্ব সম্পদ। ভারতীয় আদর্শের বৈচিত্র্যের মধ্যে বৃহত্তর মানব সভ্যতার ঐক্যের সুর ধ্বনিত। ভারতের উন্নতির জন্য যারা সাম্য ও সৌভ্রাত্রের জয়গান গেয়ে সামনে আসবে, ভারত তাকেই সানন্দে বরণ করে নেবে। বিশ্বসভায় ভারত শোনাবে সমন্বয়ী জীবনাদর্শের কল্যাণময় আধ্যাত্মিক বাণী।

॥ দশ ॥

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, নবীন সুভাষচন্দ্র তাঁর রাষ্ট্রপতি-পদ-প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতায় নিজের আদর্শ বিসর্জন দিতে মোটেই রাজী ছিলেন না। তাঁর ভাষণ এই অনমনীয় মানসিকতারই প্রতীক।

গান্ধীজীর মুখোভাব হরিপুরাতে কেমন হয়েছিল জানি না, কিন্তু মনে হয়, তাঁর সেই বিখ্যাত নির্দন্ত হাসি, সেই সরল-নিষ্পাপ মূর্তির অন্তরালে রূঢ়-নির্দয় সিদ্ধান্ত রূপ নিয়ে নিয়েছিল।

সুভাষের হরিপুরা-বক্তৃতাতেই গান্ধীবাদের সঙ্গে তাঁর সংঘাত হয়ে উঠেছিল। অতি-সতর্ক রচনা-রীতিতেও সেই মৌল পার্থক্য ঢেকে রাখা যায় নি। একটু বিশ্লেষণ করলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে পড়বে ঃ

১. গান্ধীজী কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী। তিনি মানুষের কাছে আশা করেছেন আত্ম-সংযম, আর্ষ-জীবনযাত্রা। কিন্তু সুভাষ-চন্দ্র জনসংখ্যাকে পরিকল্পিত পন্থায় সীমিত করতে চেয়েছেন। স্পষ্ট করে না বললেও, বোঝা যায়—প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তিনি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় আগ্রহী।

২. গান্ধীজী স্বাধীনতার পর কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন।[১৭৯] কিন্তু সুভাষের চিন্তাধারা অন্য খাতে বয়েছে। তিনি তুরস্ক বা রাশিয়ার উদাহরণ দেখে শিখেছেন যে স্বাধীনতা ও পুনর্গঠনের দায়িত্ব একই দলকে নিতে হয়, হরিপুরায় সে কথা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন।

৩. গান্ধীজী চেয়েছেন, একমাত্র দেবনাগরী লিপিই সারা ভারতে প্রচলিত হোক। তাঁর মতে, রোমান লিপি জনগণের ওপর একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, জনজাগরণই একে অবাঞ্ছিত করে তুলবে।[১৮০] কিন্তু জাতীয় ঐক্যের পক্ষে, সুভাষের মতে, রোমক লিপি একটা অপরিহার্য্য বিষয়।

৪. গান্ধীজী তিরিশের দশকে কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রীদের অনুপ্রবেশ ও প্রাধান্য বিস্তারে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেছিলেন। নৈষ্ঠিক খদ্দর-ধারী অহিংসকদের নিয়ে তিনি কংগ্রেসের শুদ্ধিযজ্ঞের কথা ভেবেছেন আর সেটা না পেরে নিজেই তিনি বিদায় নিয়েছেন। অথচ সুভাষ-কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলকে (CSP) স্বীকার করে নিতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন কিষাণ সভা ও ট্রেডইউনিয়ানগুলোকেও।

৫. সুভাষ হরিপুরাতে লেনিন, রাশিয়া, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি নিয়ে অনেক কথা বলেছেন যা গান্ধীজীকে চিন্তিত করতে বাধ্য। গান্ধীজী ধনতন্ত্রের অবসান চান নি, দেশের ধনিক-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। কংগ্রেসের অর্থভাণ্ডারে অকৃপণভাবে যোগান দিয়েছে গান্ধী-শিষ্য প্যাটেলের অনুগ্রহভাজন বোম্বে-গুজরাটের মালিকশ্রেণী। গান্ধীজীর প্রধান ভরসা বিড়লা, আশ্রমের জন্যও তাঁর বিপুল দায়িত্ব নিতে হয়েছে। সুভাষ যেভাবে haves-দের বিরুদ্ধে বলেছেন, তাতে সংশয়টা বেড়ে গেছে বৈকি।

৬. সুভাষ সংগ্রামের কথা বলেছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সূত্রগুলো দেখিয়ে দিয়ে নির্মম আঘাতের কথা বলেছেন। এটাও গান্ধীজীর অনভিপ্রেত। তিনি ইংরেজের সর্বনাশ চান নি, ইংরেজের কাছ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিও তাঁর কাম্য নয়। তাঁর শত্রুকে ভালবাসার নীতিতে আঘাত করার প্রশ্ন থাকতে পারে না।[১৮১] বিপক্ষদল অত্যাচার করলেও জনসাধারণ কিছুতেই বলপ্রয়োগ করতে পারবে না এটাই তাঁর শিক্ষা।

৭. কৃষি-উন্নয়নের ব্যাপারে সুভাষ প্রথমেই জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এটা গান্ধীজীর আদর্শ বিরোধী। গান্ধীজী বহুবারই জমিদারদের অভয় দিয়েছেন, অছিবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেছেন তাঁদের।[১৮২] জমিদারদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য মনে করিয়ে দিয়ে তিনি ব্যবস্থাটার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।[১৮৩]

৮. সুভাষচন্দ্র বৈদেশিক প্রচার এবং যোগাযোগের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। অথচ এ ব্যাপারে গান্ধীজীর মানসিকতা বিচিত্র। গান্ধীজীর ইচ্ছেতেই ইংলণ্ডে কংগ্রেসের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অনেক আগেই, সেকথা আমরা জানি।

৯. পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য, কোনো দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা বা অর্থ-কাঠামো নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না। আমরা চেষ্টা করব সকলের সঙ্গেই সু-সম্পর্ক রাখতে। উদাহরণ হিসাবে

সুভাষ রাশিয়ার এই বাস্তববাদী পররাষ্ট্রনীতির উল্লেখ করায় তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মাখামাখির এই পরিকল্পনা মনে হয় গান্ধীকে ভীত করে তুলেছিল।

১০. ব্যাপক আন্দোলনের লক্ষ্য সামনে রেখে সুভাষ দেশের সকল দল ও মানুষকে কংগ্রেস-মঞ্চে সামিল হতে বলেছেন। বামপন্থীদেরও তিনি সাদর আহ্বান জানিয়েছেন। একথাও বলেছেন, বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির মনোভাবে তিনি খুশী। স্বভাতঃই গান্ধীজী কংগ্রেসের শুচিতা রক্ষার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

১১. সুভাষ তাঁকে সব চাইতে বড় আঘাত করেছেন শিল্পায়নের কথা বলে। পরিকল্পিত শিল্পব্যবস্থায় সুভাষ কুটীর শিল্পের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু একটা ব্যাপক শিল্পায়ন পরিকল্পনা গান্ধীবাদের মর্মমূলেই পৌছে দিয়েছে কঠিনতম আঘাত।

১২. এই বক্তৃতায় বোঝা গেছে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্র-কেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিতে চান। অথচ গান্ধীজী বিকেন্দ্রীত পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। নব-নৈরাজ্যবাদী হিসেবে রাষ্ট্রকে তাঁর বড্ড অবিশ্বাস।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—যখন তাঁরা কাছাকাছি এসেছেন, তখনো গান্ধী-সুভাষে মৌল পার্থক্য থেকে গেছে।[১৮৪] গান্ধীজী তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছেন তাঁর যাদুকরী মায়ায় মুগ্ধ করবেন বলে। কিন্তু সুভাষ গান্ধীজীর ছত্রছায়ায় বিশ্রাম নিতে এসেছেন পরবর্তী সংগ্রামে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যই।

শুধু বক্তৃতায় নয়, সুভাষ এবার কাজেও সেই প্রত্যাশিত আঘাত হানলেন। তাঁরই উদ্যোগে গড়ে উঠল প্ল্যানিং কমিটি। কৈশোর থেকেই দেশের দারিদ্র্য ও দুরবস্থা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। প্রথম দিকে সভাবতঃই আবেগপ্রবণতা ছিল। পরিণত বয়সে তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাস্তববাদীর মতোই পরিকল্পনা-কমিটি গড়ে দিলেন দেশের দুঃখমোচনের পথ-নির্দেশের জন্য।[১৮৫] প্রচারের কৌশলে অবশ্য

কৃতিত্বটা নেহরুকে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে বিভিন্ন মহলে, কিন্তু প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গিরি (যিনি তখন পরিকল্পনার ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন) সুভাষকে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ইতিহাসের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[১৮৬] বিদেশ-প্রবাসী নেহরুকে সুভাষই পরিকল্পনা-কমিটির সভাপতিত্ব নিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। নেহরুকে তিনি চেয়েছিলেন এর সার্থক দায়িত্ব-পালনের জন্য।[১৮৭] আসলে, সুভাষচন্দ্র দেশের দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করার ব্যাপারে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। স্বাধীনতার পুণ্যলগ্ন থেকেই যাতে এই ব্যাপারে কিছু করা যায়, সেই জন্য তিনি অগ্রিম ব্যবস্থা নিতে চেয়েছেন। য়ুরোপে এবং, বিশেষ করে রাশিয়ায় পরিকল্পিত অর্থনীতির সুফল তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।[১৮৮]

পরিকল্পনা-সংক্রান্ত বক্তব্যেও তাঁর মানসিক আধুনিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনে, শিল্পমন্ত্রী-দের সভায় এবং প্ল্যানিং কমিটিতে প্রদত্ত তিনটে ভাষণে তাঁর চিন্তা-ধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

শিল্পায়ন বলতে কি বোঝায় সেটা সুভাষ বৈজ্ঞানিকদের সামনে জানিয়েছিলেন। এদেশে শিল্প-পুনরুদ্ধার নয়, সমস্যা শিল্পায়নের। তাঁর মতে, এদেশে দরকার শিল্প-বিপ্লব। বৃটেনের মতো ধীর গতিতে এদেশে শিল্প-সমৃদ্ধি অসম্ভব, আমাদের গ্রহণ করতে হবে রাশিয়ার পথ। এই ব্যবস্থায় কুটীরশিল্পের প্রাপ্য স্থান থাকবে বটে, কিন্তু প্রধানতঃ যন্ত্র-শিল্পের উন্নয়নই হবে এর মৌল বিষয়।

তিনি শিল্পায়ন চান কয়েকটা কারণেঃ

১. প্রথমতঃ, বেকারী দূর করার জন্য। যান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থায় কৃষির বহু শ্রমিক উৎখাত হবে। এদের চাকরী দিতে হবে শিল্পক্ষেত্রেই।

দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যও শিল্পায়ন দরকার।

তৃতীয়তঃ, বিদেশ-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্যও এটা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও শিল্পায়নের সঙ্গে যুক্ত।

তিনি মূলশিল্পের বিকাশ, শিল্পবিষয়ক গবেষণা, স্থায়ী গবেষণা-কেন্দ্র এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, এ-দেশে অর্থনীতি ও বিজ্ঞানকে হাত ধরে চলতে হবে। গবেষণালব্ধ বিজ্ঞান-সিদ্ধিকে প্রয়োগ করতে হবে জনকল্যাণের কাজে।

পরিকল্পনা-কমিটির সভাতেও তিনি রাশিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে রাশিয়াও ভারতের মতো অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ ছিল, তার দ্রুত রূপান্তর আমাদের প্রেরণা জোগাবে।

শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে তিনি শিল্পের শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, যদি মূল শিল্পের উন্নতি বিধান করা যায়, তাহলে মাঝারি ও কুটীরশিল্পও তার থেকে উপকৃত হবে। সুতরাং শিল্পায়ন চাইই। যদি সেটা পাপ হয়, প্রয়োজনীয় পাপ।

শুধু ভাষণে নয়, সুভাষ পরিকল্পিত শিল্পায়নের পক্ষে প্রচারে নেমেছিলেন। বোম্বাই, লখ্নৌ, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি সমাজতন্ত্র এবং পরিকল্পিত শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, আমাদের কর্ত্তব্য হল ছক তৈরী করে রাখা যাতে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই আমরা কাজ শুরু করতে পারি। এই জন্যই প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়েছে।[১৮৯]

বলা বাহুল্য, গান্ধীজী রুষ্ট হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছেন যে, এতদিনে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ব্যর্থ হতে চলেছে। গভীর বিতৃষ্ণায় তিনি লিখেছেন, সত্যি বলতে কি, আমি কমিটির কার্য্যকলাপের উপযোগিতা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, আর এর কোনো বিবরণ ওয়ার্কিং কমিটিকে দেওয়া হয় কিনা জানি না। এর অসংখ্য সাব-কমিটিগুলোর অস্তিত্বের সার্থকতা বুঝতে আমি

অক্ষম। আমার মনে হয় প্রভূত অর্থ এবং প্রচুর সময় এমন একটি কাজে ব্যয় হচ্ছে যার ফল একেবারেই কিছু হবে না, কিম্বা অত্যন্ত সামান্য কিছু হবে।[১৯০] ওয়ার্কিং কমিটিও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। পরিকল্পনা-কমিটি গঠনে নাকি এমন সন্দেহ বিভিন্ন মহলে দেখা দিয়েছে যে, গ্রামীন শিল্প অবহেলিত হবে। সুতরাং এই ভুল ধারণা দূর করা দরকার, আর ব্যাপারটা উচিত গান্ধীজীর কাছে উপস্থাপিত করা।[১৯১]

গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত এবার পরিষ্কার। আর দেরী করা উচিত হবে না। গান্ধীবাদের মূল ধরে যিনি টান দিয়েছেন, তাঁর ক্ষমা নেই কিছুতেই।

॥ এগারো ॥

সঙ্কট ঘনিয়ে এল ত্রিপুরীর রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন নিয়েই। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে সুভাষচন্দ্রকে পুনর্নির্বাচিত করার দাবি উঠেছে। কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' সর্বপ্রথম সুভাষের জন্য দাবি জানালেন।[১৯২] এর পরের দিন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সাজ্জাদ জাহির, জেড্ এ. আমেদ, সোহন সিং যশ, ভগৎ সিং, রামমূর্তি, সুন্দরাইয়া, নাম্বুদিরিপাদ প্রমুখ নেতারা সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের দাবি তুললেন।[১৯৩] ২২শে অক্টোবর হুমায়ুন কবির, মোয়াজ্জেম আলী চৌধুরী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দও অনুরূপ বিবৃতি দিয়েছেন। এরই সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এক বিবৃতিতে তিনি জানালেন যে, দেশের ও বিদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্যকরূপে বিবেচনা করে সুভাষচন্দ্রকেই আরো এক বছর সভাপতি রাখা দরকার। এই ব্যাপারে তিনি

গান্ধীজী এবং উচ্চতর কংগ্রেস পরিষদকে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধও জানিয়েছেন।[১১৪]

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথও সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে আগ্রহী করে তুলেছেন ডঃ মেঘনাদ সাহা। তিনি অবশ্য সরাসরি ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের কাছে তুলতে পারেন নি, অনিল চন্দের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যাপারটা অব্যাহত থাকবে যদি সুভাষচন্দ্র নতুন করে নির্বাচিত হন। তা না হলে নতুন করে পরিকল্পনার ব্যাপারে সভাপতিকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিষয়ে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ হলেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর মারফৎ গান্ধীজীকে একটা চিঠি দেন। এ বিষয়ে তিনি নেহরুকেও লিখেছিলেন।[১১৫] গান্ধীজীকে লেখা চিঠিটা এখনো অবশ্য প্রকাশিত হয় নি। নেহরুর কাছে প্রেরিত পত্রে তাঁর ইচ্ছেটা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু গান্ধীজী রাজী হন নি। ১৯৩৮ সালের ২৪শে নভেম্বর তিনি নেহরুকে জানালেন ; গুরুদেব যে চিঠি দিয়েছেন, তা তোমাকে পাঠালাম। আমি উত্তর দিয়েছি। বাংলায় বড্ড দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। এর হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে হলে সুভাষকে সভাপতিত্বের বাইরে রাখা দরকার। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত বলেই গুরুদেবকে আমি জানিয়েছি। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে লিখবেন, বা এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবেন। তখন তুমি তোমার মত জানিও।[১১৬]

এটা একটা স্মরণীয় দলিল। আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজীকে একজন অতি-সরল, গণতন্ত্রপ্রিয় এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ব্যক্তি বলে মনে হবে। কিন্তু এই সারল্যের অন্তরালেই লুকিয়ে আছেন এক অতি-সাবধানী কর্তৃত্বপ্রিয় একনায়ক। নিজের মতটা উহ্য রেখে

নেহরুকে তিনি তাঁর মত রবীন্দ্রনাথকে জানাতে বলেন নি। তাঁর নিজের আপত্তির কথা উল্লেখ করে তবেই তিনি নেহরুকে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন। তিনি ভাল করেই জানতেন, তাঁর মতের প্রতিধ্বনি করা ছাড়া নেহরুর তখন আর কোনো উপায় নেই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও সুভাষচন্দ্রকে একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন তাঁর সমর্থনের কথা, তাঁর দুটো চিঠির বক্তব্য। তবে তিনি রাষ্ট্রীক সম্প্রদায়ের বহির্ভূত মানুষ, ফলের হিসেব রাখা তাঁর কাজ নয়।[১৯৭]

সুভাষচন্দ্রও কিন্তু ইতিমধ্যে প্রার্থী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগেই তিনি বিশ্ব-পরিস্থিতির অভ্রান্ত বিশ্লেষণে যুদ্ধকে অতি-নিকটবর্ত্তী বলে মনে করেছিলেন। মিউনিক চুক্তির পরেও সঙ্কট কাটে নি বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। সেই জন্যই তিনি কংগ্রেসকে বিশ্ব-পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার জন্য হয়ত প্রস্তুত করতে চাইছিলেন। হয়ত গান্ধীবাদের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ লড়াইয়ের জন্য বামপন্থী শক্তিকে সংহত করার ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতি-পদকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। একটা টেলিগ্রামে তিনি শেষ পর্য্যন্ত গান্ধীজীর আশীর্বাদ চাইলেন।[১৯৮] ছোট্ট একটা লাইনেই তাঁর আভিজাত্যবোধ, দৃঢ়তা অথচ বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেনঃ নির্বাচনে আমায় আশীর্বাদ করুন।

কিন্তু গান্ধী রাজী হলেন না কেন?

অর্থনৈতিক-মতপার্থক্য গভীর তো ছিলই, রাজনৈতিক পার্থক্যও তখন নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। দ্বিতীয়বার সুযোগ পেলে সুভাষ ভিয়েনায় থাকাকালে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই পথে কংগ্রেসকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন—অন্য কিছু না থাকলেও অন্য কারণেই গান্ধীজী তাঁর বিরোধী হয়ে থাকবেন। সুভাষ সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিরূপতার ব্যাপারে আর কিছু ছিল কিনা, তা বলতে পারেন একমাত্র গান্ধীজীই।[১৯৯]

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে। ভারত সরকার কতগুলো গোপন-রিপোর্ট ডঃ কে. এম. মুন্সীর মাধ্যমে গান্ধীজীর কাছে পাঠিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বোম্বের জার্মান কন্সালের যোগাযোগ রয়েছে—স্থির হয়েছে, যুদ্ধ বাধলে জার্মানী সুভাষের ওপর নির্ভর করতে পারবে।[২০০] বিপ্লবী প্রতুল গাঙ্গুলীও এই ধরণের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেছেন, জার্মান নাট্যবিশারদ অটো জ্যারেক-এর 'জার্মান অডিসী' গ্রন্থেও একথা বলা হয়েছে— কিন্তু কথাটা কতদুর সত্যি, সেটা বলা দুষ্কর।[২০১]

তবে, মনে হয় শান্তিপ্রিয় গান্ধীজী তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইংরেজ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলল অভ্যস্ত রীতিতেই।

সে যাই হোক, সুভাষচন্দ্র, আজাদ এবং পট্টভী সীতারামাইয়ার নাম প্রস্তাবিত হল। বোঝা গেল প্রতিযোগিতা হবেই।

হঠাৎ আনন্দ সাহেব পট্টভীর পক্ষে সরে দাঁড়িয়ে একটা বিবৃতি দিলেন। পাল্টা বিবৃতিতে সুভাষ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছে জানালেন। তাঁর মতে, এই ধরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাঞ্ছনীয়, কারণ এতে নির্বাচক-দের ইচ্ছে প্রতিফলিত হয়। তবে নির্বাচন হওয়া উচিত কর্মসূচী এবং নির্দিষ্ট সমস্যার ভিত্তিতে। ফেডারেশন নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষ অনিবার্য্য বলেই তিনি চান পুনর্নির্বাচন (জানুয়ারী ২১)। ২৪ তারিখেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য—প্যাটেল, প্রসাদ, দৌলতরাম, কৃপালনী, বাজাজ, শঙ্কররাও দেও এবং ভুলাভাই দেশাই এক যৌথ বিবৃতিতে জানালেন যে, সীতারামাইয়াকে যোগ্যতর বিবেচনা করেই তাঁরা মনোনীত করেছেন। বিশেষ করে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া পুনর্নির্বাচন না হওয়াই সঙ্গত।

সুভাষ এবার প্রতিবাদ জানালেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে পট্টভী সম্পর্কে আলোচনা হল কখন? ব্যক্তিগতভাবে এঁরা যতই না পট্টভীর পক্ষে প্রচারে নামুন, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে কোনো মিটিং ছাড়াই এঁরা বিবৃতি দিলেন কেমন করে?

আর পুনর্নির্বাচন তো আগেও হয়েছে। তিনি নিজেই এই ধরণের নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। আরো কথা আছে। এই

নির্বাচন ফেডারেশন নিয়ে আগামী সংগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত। সেই জন্য দরকার এখন বামপন্থী রাষ্ট্রপতি যাতে সংগ্রাম আপোষহীনভাবে চলতে পারে। যদি নরেন্দ্র দেবের মতো কাউকে গ্রহণ করা হয়, তবে তিনি সানন্দে সরে যেতে রাজী আছেন।[২০২]

এরপরে পট্টভী, প্যাটেল, নেহরু ও প্রসাদ পরপর বিবৃতি দিলেন। নেহরুর বিবৃতি একটু ভিন্ন ধরণের হলেও মূলতঃ তিনি গান্ধীভক্তদেরই সাফাই গেয়েছেন। প্যাটেল ও নেহরু উভয়ই ফেডারেশনের ব্যাপারে কংগ্রেসের আপোষ বিরোধী মনোভাবের উল্লেখ করেছেন। নেহরু বিশেষ করে ফেডারেশনের ব্যাপারে সুভাষের অভিযোগ (সুভাষ বলেছিলেন, নেতাদের কেউ কেউ বোঝাপড়ার চেষ্টায় আছেন) নিয়ে মৃদু তিরস্কার করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবেঃ অভিযোগটা কি মিথ্যে? ১৯৩৮ সালের শেষ দিকেই তো ফেডারেশন নিয়ে কংগ্রেস নেতারা আপোষের পথ খুঁজছিলেন।[২০৩] ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত নথিপত্রগুলোও এই কথাটা প্রমাণ করছে। ওরা রিপোর্ট দিয়েছে, এই সময় যদি গান্ধী ও বড়লাটের মধ্যে একটা আলোচনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তো খুব মঙ্গল। নয়ত সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বামপন্থী অনুগামীরা যদি পুরোপুরি ক্ষমতায় এসে যান, তখন এই বোঝাপড়ার চেষ্টা অর্থহীন হয়ে পড়বে। ওদের সংবাদদাতা বলছেন, গান্ধীজী সরাসরি বড়লাটের সঙ্গে অথবা কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় রাজী আছেন। মধ্যস্থ হবার জন্য আগা খাঁ-র নামও প্রস্তাব করা হয়েছে।[২০৪]

সুভাষ আরো দুটো বিবৃতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, নির্বাচন আরো হয়েছে, যদিও এবারের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি। সুতরাং পুনর্নির্বাচনটা অভূতপূর্ব বা সংবিধান-বহির্ভূত—কোনোটাই নয়। তিনি আরো বলেছেন, যদি সত্যিকারের ফেডারেশন বিরোধী কাউকে বেছে নেওয়া হয়, তিনি সরে যাবেন। তা না হলে, যেহেতু অনেকেই তাঁকে চেয়েছে, তাঁর সরে যাওয়াটা উচিত হবে না। তবে সেক্ষেত্রে নির্বাচকদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করাটা হবে অন্যায়, অগণতান্ত্রিক ব্যাপার।

!! বারো !!

তারপর ঘটল সেই আশ্চর্য্য ঘটনা।

সুভাষ দুশোরও বেশী ভোটে জিতেছেন (সুভাষ পেয়েছিলেন ১৫৮০ ভোট, সীতাবামাইয়া—১৩৭৭) ভোট পড়েছিল এভাবে ঃ[২০৫]

অঞ্চল	সুভাষচন্দ্র	পট্টভী সীতারামাইয়া
১. ব্রহ্মদেশ	৮	৬
২. উৎকল	৪৪	৯৯
২. তামিলনাদ	১১০	১০২
৪. গুজরাট	৫	১০০
৫. পাঞ্জাব	১৮২	৮৬
৬. বেরার	১১	২১
৭. বাংলা	৪০৪	৭৯
৮. কেরালা	৮০	১৮
৯. অন্ধ্র	২৮	১৮১
১০. উত্তরপ্রদেশ	২৬৯	১৮৫
১১. বিহার	৭০	১৯৭
১২. দিল্লী	১০	৫
১২. মহারাষ্ট্র	৭৭	৮৬
১৪. আসাম	৩৪	২২
১৫. সিন্ধু	১৩	২১
১৬. বোম্বে নগরী	১৪	১২
১৭. নাগপুর	১২	১৭
১৮. আজমীর	১৮	৮
১৯. কর্ণাটক	১০৬	৪১
২০. মহাকোশল	৬৭	৬৮
২১. উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	২৩
	১, ৫৮০	১, ৩৭৭

ব্যাপারটা গান্ধীশিবিরের বজ্রশক্তিকে আঘাত করল। এঁদের অনেকেই অবশ্য একটা সরাসরি সংগ্রাম চাইছিলেন। প্যাটেল আগেই রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং নেহরুকে লিখেছিলেন যে, এবার সত্যিই নেতৃত্ব এবং তার সমালোচকদের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সুযোগ ঘটেছে। গান্ধীজী নিজেও জানিয়েছিলেন যে, সুভাষ জিতলে তাঁর সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করা হবে না। কৃপালনীকে তিনি বলে-ছিলেন, সুভাষের ক্যাবিনেটে তাঁরা যেন কেউ না থাকেন। এই অবস্থায় পদত্যাগ করা উচিত হবে কিনা, কৃপালনী জানতে চাইলে গান্ধীজী বলেছিলেন: Certainly, how could you be in his cabinet? । সুতরাং বিরোধের পাত্র পূর্ণ হল।[২০৬]

গান্ধীজীও তাঁর সেই কুখ্যাত বিবৃতি দিলেন। প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন পট্টভীর সমর্থক, সুতরাং এই পরাজয় যতটা পট্টভীর, তার চাইতে বেশী তাঁর নিজের (the defect is more mine than his). এতে বোঝা গেছে যে, সদস্যরা তাঁর নীতি ও আদর্শকে গ্রহণ করে নি। এই পরাজয়ে তিনি আনন্দিত।

অবশ্য মনের দুঃখে তিনি কংগ্রেসের ভুয়ো সদস্যপদ নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে অনেক সদস্যেরই ভোট দেবার নৈতিক দাবি ছিল না।

এরপর তিনি আরো বিচিত্র কথা বললেন: আর যাই হোক, সুভাষবাবু তো দেশের শত্রু নন। তিনি দাবি করেন, তিনি সব চাইতে প্রগতিশীল। সংখ্যালঘিষ্ঠরা তাঁর সাফল্যই কামনা করবেন। তাঁর সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলে কংগ্রেসের বাইরে চলে আসবেন। যে-সব কংগ্রেসী কংগ্রেসের বাইরে থাকবেন, তাঁরাই কংগ্রেসকে প্রতিনিধিত্ব করবেন বেশী করে।[২০৭]

৪ই ফেব্রুয়ারী সুভাষ বিবৃতিতে বললেন যে, গান্ধীজী পট্টভীর পরাজয়টা নিজের বলে মনে করেছেন জেনে দুঃখিত; কারণ ভোটার-

দের গান্ধীজীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে বলা হয় নি। এই বিবৃতিতে তিনি কংগ্রেসের ঐক্যের জন্য অনুরোধ জানালেন। আরো জানালেন, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য কখনো কখনো ঘটেছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর প্রতি তাঁর ভক্তি কারো চাইতে কম নয়। আর তিনি যদি সবাইর সমর্থন পেয়েও ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির আস্থা না লাভ করতে পারেন, সেটা তাঁর পক্ষে হবে অত্যন্ত দুঃখের।

কিন্তু ঐক্যের আবেদন বা গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ তখন একেবারেই মূল্যহীন। গান্ধীজী কর্তব্য নির্দ্ধারণ করে ফেলেছেন। এই গান্ধীজী অহিংসা আর সারল্যের প্রতীক নন, ইনি রাজনীতিবিদ— এঁকে দল রক্ষা করতে হয়, একাধিপত্য বজায় রাখতে হয়, সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাঁর নিজস্ব তত্ত্বকে।

গান্ধীবাদের মূলেই টান পড়েছে এতদিনে। পরিকল্পনা, কৃষি-বিপ্লব, শিল্পায়ন এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্প্রসারণের উদ্যোগ তাঁর অর্থনীতিক-তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। ওদিকে আবার বামপন্থী-শক্তির প্রতিষ্ঠা ইংরেজের সঙ্গে আপোষকেও অসম্ভব করে তুলবে। সব চাইতে বড় কথা, গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্বকে না মেনে কেউ এতদিন কংগ্রেসে কল্কে পায় নি। এবারে কি সেই একাধিপত্যও বিপন্ন?

সুতরাং অসহযোগের দার্শনিক এবার অসহযোগ শুরু করলেন —ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেস-সভাপতির বিরুদ্ধেই।[২০৮]

আক্রমণ কোন্ দিক থেকে আসবে, নিশ্চয়ই সুভাষ সেটা বুঝেছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি ওয়ার্ধাতে দেখা করলেন। হৃদ্য পরিবেশে কথাবার্তা হল। গান্ধীজী সহযোগীতার প্রতিশ্রুতিও দিলেন সহজ ভাবেই।

কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরী হল না। সুভাষ অসুস্থতার জন্য ওয়াকিং কমিটির বৈঠক নির্দ্ধারিত দিনে স্থগিত রাখার জন্য আবে-

দন জানানোয় গান্ধী-গোষ্ঠী একটা অজুহাত খুঁজে পেল। কমিটির বারো জন সদস্য—প্যাটেল, আজাদ, প্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, ভুলা-ভাই, পট্টভী, হরেকৃষ্ণ মহতাব, কৃপালনী, গফফুর খাঁ, জয়রাম দাস এবং যমুনালাবাজ বাজাজ - পদত্যাগ করলেন। নিরপেক্ষতার অভিনয়ে নেহরুর জোড়া নেই। তিনি পদত্যাগ করলেন না, কিন্তু পৃথক বিবৃতি দিলেন যা পদত্যাগের মতোই অর্থবহ। তাঁর বিবৃতির অর্থ পদত্যাগ কিনা, তাঁর উত্তরে তিনি বলেছেন 'not quite corr-ect, আবার সেই সঙ্গে স্বীকার করেছেন and yet ..correct enough ;

পরিষ্কার ছক-বাঁধা ব্যাপার। ইতিপূর্বে প্যাটেল তাঁকে লিখে-ছিলেন ঃ আমাদের যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেবার জন্য বা পৃথক বিবৃতি দেবার জন্য যে চিঠি তোমাকে দিয়েছিলাম, তার উত্তর বার-দোলীতে পেয়েছি। বাপুই এভাবে তোমায় লিখতে বলেছিলেন। ...যুক্ত বিবৃতি তাঁর আদেশেই প্রচারিত হয়েছে।

আমরা পরাজিত হয়েছি এর জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত নই, বরং খুশী। একমতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটি ছাড়া কাজ ভালভাবে চলতে পারে না। এটা করবার একটা সুযোগও আমি খুঁজছিলাম। ·· তোমার মনোভাব আমার জানা নেই। তবে আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি, আমরা যা করতে চলেছি, তার জন্য আমাদের দোষ দেবে না।[২০৯]

ইতিহাসের নাকি পুনরাবৃত্তি হয় না। কিন্তু রাজনীতিতে সবই সম্ভব। ১৯৩৬ আর ১৯৩৯-এর মধ্যে কি চমৎকার মিল। কর্ম-প্রণালীতে, কৌশলে যেন একই ঘটনা। সেই চাপ দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করানোর এক ঘৃণ্য নাটক। সেদিন দুর্বলচিত্ত জবাহরলালের স্বাতন্ত্রবাদী অভিমানকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ক্ষমতালোভী গান্ধী-চক্র। ইতিহাসের গতিপথটা অনুধাবন করে নেহরু তাই গান্ধী-মর্দ্দিরের পাণ্ডার খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। তারপর কোথায় গেল

তাঁর সমাজতন্ত্র, কোথায় হারাল তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ! গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি হৃদয়ের বন্ধনে নাকি বাঁধা।

তবু হয়ত চক্ষুলজ্জায় বেধেছিল। তাই চির-অস্থির নেহরু নিরপেক্ষতার একটা মুখোশ পরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংগ্রামের সময়েই শিবিরগুলো সুস্পষ্টভাবে ভাগ হয়ে যায়। অভিনয় দিয়ে নিজেকে আর আড়াল করা চলে না তখন।

॥ তেরো ॥

উত্থান-শক্তিহীন সুভাষ ত্রিপুরীতে গেছেন। এবার এ্যাম্বুলেন্সে। ডাঃ নীলরতন সরকার নিষেধ করেছেন। আশঙ্কা করেছেন এতে প্রাণ-সংশয় হতে পারে। কিন্তু কে শোনে সেই সাবধানী নিষেধাজ্ঞা ?

জীবন-মৃত্যুকে কবেই তো সুভাষ তুচ্ছ বলে জেনে এসেছেন। হিসেবের টানাটানিতে কি সেই ভাবনাহীন প্রাণশক্তি একটুকুও বিচলিত হবে ? তাই সংজ্ঞা স্তিমিত হয়ে এলেও কম্প্রহস্তে লিখিত হয় অগ্নি-বর্ষী বাণী। কংগ্রেসের ইতিহাসে এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আর আসে নি বলেই মৃত্যু-ভয়কে তুচ্ছ করেই উপস্থিত হয়েছেন সাগ্নিক দেশনায়ক।

পৌরোহিত্য করলেন আজাদ। ভাষণ পাঠ করতে হল পিতৃ-প্রতীম শরৎচন্দ্রকে।

—বিষয়বৈচিত্র, তাত্ত্বিকতা, কবিত্ব, ভাবুকতা—কোনো দিক থেকেই ত্রিপুরী-বক্তৃতাকে হরিপুরা-ভাষণের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। অসুস্থতা সত্ত্বেও সুভাষ এখানে আরো উগ্র, সংযত-বাক কিন্তু প্রত্যয়ে দৃঢ়।

তিনি জানালেন, হরিপুরার পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক কিছু ঘটে গেছে। মিউনিক চুক্তি ইংগ-ফরাসী শক্তির দুর্বলতা

প্রকট করে দিয়েছে। এর পরেও ঘটেছে স্পেনের গৃহযুদ্ধ। বিনা-যুদ্ধে জার্মানী য়ুরোপে একাধিপত্য বিস্তার করেছে। ইটালী এবং জার্মানীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংগ-ফরাসী শক্তি রাশিয়াকে য়ুরোপীয় রাজনীতিতে বিপন্ন করে তুলতে চাইছে বটে, কিন্তু এটা একটা সাময়িক ব্যাপার। বৃটেনের দুর্বলতা এখন স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

সুতরাং এটাই সময়। এখনই স্বাধীনতার দাবি নিয়ে আমাদের উচিৎ বৃটেনকে একটা চরমপত্র দেওয়া। য়ুরোপে একটা স্থায়ী মীমাংসা হয়ে গেলে বৃটেন কিন্তু উগ্র দমননীতি চালাবে। কিন্তু এখন তাকে আঘাত করলে সে পড়বে সঙ্কটে।

অনেকেই হয়ত এই ব্যাপারে খুব আশাবাদী নন। কিন্তু সময় আমাদের অনুকূল। কংগ্রেস আটটা প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করায়, আমাদের বাড়তি সুযোগ এসেছে। দেশে এসেছে নতুন উদ্দীপনা। দেশীয় রাজ্যগুলোতেও নবচেতনা জেগেছে কিছুদিনের মধ্যে। এর চাইতে অনুকূল লগ্ন আর কি আসবে আমাদের জীবনে?

অবশ্য আমাদের এই শেষ সংগ্রামকে ব্যাপক আকার দিতে হবে। কিষাণসভা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অনান্য সংগ্রামী শক্তি-গুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে এবার আমাদের চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে।

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে—একথা স্বীকার করেও চরম আশাবাদীর মতো তিনি বলেছেন, এটা একটা সাময়িক সমস্যা—মেঘ কেটে যাবে নিশ্চয়ই, ফিরে আসবে বাঞ্ছিত ঐক্য। মতিলাল, চিত্তরঞ্জন—এঁদের প্রেরণা আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে। বিশেষ করে, গান্ধীজী আমাদের মধ্যে এখনো আছেন, তিনিই আমাদের উদ্ধার করবেন এই সঙ্কট-সময় থেকে।

গান্ধীজী কিন্তু ত্রিপুরীতে আসেন নি। সেই সময় তিনি গুজ-রাটের ছোট দেশীয় তালুক রাজকোটের প্রজাদের দাবি নিয়ে শাসক-দের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ব্যস্ত।

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। প্রথমতঃ সদ্য-পরাজয়ের গ্লানিটা তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি। নেহরুকে তিনি আগেই লিখেছিলেন, এবারের কংগ্রেস-অধিবেশন থেকে তিনি দূরেই থাকতে চান। নির্বাচনের ধরণ এবং নির্বাচন-পরবর্ত্তী অবস্থা দেখে তিনি স্থির করেছেন, দূর থেকেই তিনি দেশের সেবায় নিজেকে আরো বেশী করে নিয়োজিত রাখতে পারবেন।[২১০]

দ্বিতীয়ত: গান্ধীজী রাজকোটের আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকার মানেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্কট মেটানোর কাজে এক সঙ্গে বসতে হবে না। সুভাষ নিজেই প্রচণ্ড অসুস্থ, তাঁর পক্ষেও রাজ-কোট ছোটা অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, সমগ্র দেশের দৃষ্টি রাজকোটের দিকে টেনে রেখে সুভাষের মর্য্যাদাকে কিছুটা ম্লান করে দেওয়া যাবে। মানুষ জানবে ত্রিপুরী কিছুই নয়, স্বাধীনতা-আন্দোলনের আসল কর্মকেন্দ্র হল রাজকোট।

চতুর্থতঃ, ত্রিপুরীতে যে হীন-জঘন্য নাটক রচিত হবে, তার দৃশ্যগুলো সন্ত-শ্রেণীর মানুষের চোখে ঠিক সুরুচিকর নয়। হাজার হোক, নামাবলী গায়ে দিলে কিছু-কিছু অভ্যাসও রপ্ত করে নিতে হয়।

বলা বাহুল্য, সুভাষের চরমপত্রের প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। এটাই স্বাভাবিক ছিল। ত্রিপুরী-নির্বাচনের পরেই গান্ধীজীর বিবৃ-তিতে—এর আভাষ পাওয়া গিয়েছিল। অবস্থাটা অনুমান করে নেহরুও বলেছিলেন, প্রতিনিধিমণ্ডলী কিন্তু রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে এক রকম এবং কংগ্রেস-অধিবেশনে ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মণ্ডলীর সাধারণ ইচ্ছেকে প্রতিফলিত করেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা যদি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর অন্য ধরণের সিদ্ধান্ত করেন, তবে সেটাই বলবৎ থাকে।[২১১]

সুতরাং এবারে গান্ধী অনুচররা তাঁর নামটা সামনে রেখে নির্বাচকদের ওপরে সু-পরিকল্পিত পন্থাতেই চাপ সৃষ্টি করেছেন, গান্ধীজীকে হারাতে দেশ সত্যিই প্রস্তুত ছিলনা। তাছাড়া, আরো কারণ আছে। আটটা প্রদেশে মন্ত্রীত্ব পাওয়াতে কংগ্রেসীরা তখন সুখের হাওয়ায় ভাসছে। সম্মান, প্রতিপত্তি, চাকরীদান, স্বজনপোষণ সবই হয়েছে। যাঁরা তখনো ক্ষমতা পান নি, তাঁরা সাগ্রহে দিন গুনছেন। এরই মাঝে মরণপণ সংগ্রামের আহ্বান জানানো হঠকারিতা ছাড়া আর কি? কুসুম-বিস্তীর্ণ পথ ছেড়ে কে সহসা যেতে চাইবে মৃত্যু-কঠিন দুর্গম-দুস্তর লক্ষ্যের সন্ধানে? দ্বিধায় এতদিনের সঙ্গীরাও ছেড়ে যাবে, নিকটও হয়ে যাবে দূর। সুতরাং কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের মধ্যেও এসেছে দ্বিধা, অন্যদেব তো কথাই নেই।

কিন্তু আরো বাকি আছে। পরাজয়ের জ্বালায় অস্থির গান্ধী-বাদীরা প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর উল্লাসে যেভাবে সুভাষকে গ্রাস করতে চেয়েছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। জাতির রাজনৈতিক জীবনে এই মসীলেপনের অপরাধ ভাবীকাল কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না।

এবার পন্থ-প্রস্তাব পেশ করা হল। বলা হল, জাতির এই দুর্দিনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অবিচল আস্থা রাখতে হবে এবং ওয়াকিং কমিটি তাঁর সম্মতি নিয়েই গঠন করতে হবে। ব্যাপারটা কেমন হল? কংগ্রেস-গঠনতন্ত্রের ১৫ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে (এই গঠন-তন্ত্র গান্ধীজীরই তৈরী) ওয়াকিং কমিটি-গঠনের নিরঙ্কুশ অধিকার কংগ্রেস-সভাপতিরই। তাহলে পন্থ-প্রস্তাব কি কংগ্রেস-গঠনতন্ত্রেরই বিরোধী নয়? গান্ধীজীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে গান্ধীজীরই রচিত-গঠনতন্ত্রকে হত্যা করা হল না? তাছাড়া, ১৯৩৪ সালের পর গান্ধীজী তো কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যই নন। তাহলে কংগ্রেস-সভাপতির স্বীকৃত অধিকারকে তিনি সীমায়িত করবেন কোন্ নিয়মে?

সুভাষ সাংবিধানিক প্রশ্নটি তুলেছেন। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা, উদারতার সঙ্গেই চেয়েছিলেন একটা সর্বসম্মত সংশোধন। কিন্তু তা অগ্রাহ্য হল। ২১৮- ১৩৫ ভোটে পন্থ-প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। রচিত হল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সব চাইতে কলঙ্কিত অধ্যায়টা।

শালীনতার মাত্রাও গেল সীমা ছাড়িয়ে। সুভাষ অসুস্থ? মোটেই না। ওটা রাজনৈতিক চালমাত্র, সহানুভূতি-আদায়ের চেষ্টা একটা। কিন্তু যখন মেডিক্যাল বোর্ড গঠিত হল, দেখা গেল ব্যাপারটা গুরুতর। রোগটা সাংঘাতিক,, সত্যিই আশঙ্কাজনক। দেশের মানুষ সত্যটা জানল, আর ওপক্ষের সত্যান্বেষীদের সত্যের প্রতি আগ্রহ দেখে নিশ্চিন্ত হল।[২১২]

ব্যাপারটা আরো অশোভন হয়ে উঠল শেষ-পর্য্যায়ে। রাষ্ট্র-পতিকে মহা সমারোহে বিদায় দেওয়াই ছিল প্রচলিত রীতি। এবারেই ঘটল এর ব্যতিক্রম। শেষ সময় অসুস্থ রাষ্ট্রপতিকে (সভাপতি) ঘিরে রইলেন শুধু ডাক্তার, পরিবারের কয়েকজন আর কিছু অনুগামী। ক্ষীণকণ্ঠে সুভাষ নালিশ জানালেন, ধূসর আকাশের কাছে আমি পরাজয় মানি না, পরাভবের ব্যর্থতা নিয়ে সমাজে ফিরতে চাই না।[২১৩]

কিন্তু বিজয়ী বীররা ফিরে গেছেন ততক্ষণে। পন্থ-প্রস্তাব গৃহীত হবার পর তাঁরা উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন।[২১৪] সেই উল্লাস নিয়েই তাঁরা আত্মতৃপ্তির স্ব-রচিত সাম্রাজ্যে ফিরে গেলেন। শোভনতা, সাংবিধানিক বৈধতা, ন্যায়-নীতি তাঁদের কাছে বড় নয়। সব চাইতে বড় হল শত্রুর নিধন, সে যেভাবেই হোক। যত দামেই হোক। গান্ধীজীকে বড় করতে গিয়ে গান্ধীজীর গান্ধীত্ব ভূলুণ্ঠিত হোক, তাতেও ক্ষতি নেই কোনো।

এই একনিষ্ঠতার অভাব ঘটল শুধু ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম ক্ষেত্রেই।

॥ চোদ্দ ॥

সাধারণ মানুষ কিন্তু বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সারা দেশে উত্তেজনা। বিশেষ করে, বাংলার মানুষ এই নির্লজ্জ ষড়যন্ত্রের রূপ দেখে ক্রোধে ফুঁসছে। রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গান্ধীজীকে লিখলেন যে, কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলাকে রূঢ় আঘাত করা হয়েছে, এর প্রতিকার গান্ধীজীরই করা উচিত। তাঁর ভাষায় : At the last congress Session some rude hands have deeply hurt Bengal with an ungracious Persistence, please apply without delay balm to the wound with your own kind hands and prevent it with festaring. কিন্তু গান্ধীজী তখন অনমনীয়। তিনি জানালেন যে, সমস্যাটা খুবই জটিল। তিনি ইতিমধ্যে সুভাষকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি সমাধানের কোনো পথ দেখছেন না।

সুভাষ তখনো অসুস্থ। তাঁর রোগ নিয়ে বিপক্ষদলের অপপ্রচারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন[২১৫] আর অমিয়নাথকে জানিয়েছেন তাঁর মনোবেদনার কথা। বেশী ক্ষোভ জমেছে নেহরুর বিরুদ্ধে। সুভাষের মতে একা নেহরুই তাঁর ক্ষতি করেছেন সব চাইতে বেশী।[২১৬]

কিন্তু নেহরু যে নিরুপায়।

সুভাষ তাঁকে নেতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার মর্য্যাদা দিয়েছিলেন। দুজনে এক সময় দেশের তরুণ এবং বামপন্থী শক্তির নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেই পথ আলাদা হয়ে গেল। নেহরু হয়ে গেলেন গান্ধীজীর স্বীকৃত উত্তরাধীকারী।[২১৭] গান্ধীজীর দিকে তাঁকে ঝুঁকতেই হল ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

তাছাড়া, ব্যক্তিগত দিকটাও আছে। একই মঞ্চে উঠে কখনো নেহরুর মনে হয়েছে, তিনি নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন বুঝি।

বাধ্য হয়ে সুভাষের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন অযৌক্তিকভাবে। যেমন, বোম্বেতে একটা সভায় সুভাষ ভারতের মৌল বাণীর উল্লেখ করেছিলেন। পরে উঠে নেহরু জানিয়েছিলেন—ভারতের কোন মিশন আছে, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। এদেশের অমর ঐতিহ্যের কথা কেউ বললে তাঁর বিরক্তি জন্মে। আমাদের ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত সম্বন্ধে বড়াই তাঁর অপছন্দ। আমাদের সঙ্গীত কোলাহল মাত্র, আমাদের ধর্ম পাকশালার বস্তু।[২১৮] আর একবার তিনি সুভাষকে নিষ্প্রভ করতেই তুলেছেন মৌলিক অধিকারের প্রস্তাব।

কিন্তু ১৯৩৮ সালেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নেহরু তাঁর সময়ে তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলে কংগ্রেসের ক্ষতি করেছেন। তাঁর মত ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে কংগ্রেস কোনো প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গঠন করবে না। এর ফল ভাল হয় নি। যুক্তপ্রদেশে দুজন মুসলমানকে দুটো আসন দিলেই চলত. নেহরু অঙ্ক কষে একটা আসন ছাড়তে চাইলেন। ফলে ওখানে বিক্ষুব্ধদের নিয়ে লীগ্ শক্তিসঞ্চয় করল। আজাদ তাই লিখেছেন, নেহরু তাঁর প্রিয় বন্ধু হলেও স্বীকার করতে হবে যে, তিনি তত্ত্বের কচকচিতে বাস্তব পরিবেশকে লঘু করে ফেলেন।[২১৯] বাংলায়ও এই ভুলটা হয়েছিল। মুসলমানদের তিনটে দলের মধ্যে লীগ ৪০টা, স্বতন্ত্র ৪১টা আর ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা দল পেয়েছিল ৩৫টা আসন।[২২০] অসাম্প্রদায়িক হক্ কংগ্রেসের সংঙ্গে সম্মিলিত সরকার গড়তে চেয়েছিলেন। নেহরুর তত্ত্ব অনুসারে কোয়ালিশন নিষিদ্ধ ছিল। হক্-সাহেব বাধ্য হয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছিলেন।[২২১]

কিন্তু ১৯৩৮ সালে সুভাষ সেই ভুল আসামে হতে দেন নি। সাদুল্লা-মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে এলেন তিনি। চীন আর স্পেনের দুর্দ্দিনে নেহরু ছুটে গিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু সুভাষ চীনের জন্য পাঠিয়েছেন 'মেডিক্যাল মিশন'। নেহরুর সামনে পরিকল্পনা কমিটির

কথা উঠেছে, কিন্তু সেটা গঠন করেছেন সুভাষ। এতদিনে নেহরু ক্ষমতার পার্থক্যটা বুঝলেন। বিশেষ করে তিনি রবীন্দ্রনাথের কথাটা ভুলতে পারেন না—সুভাষের নাকি ব্যক্তি হিসেবে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু যন্ত্র হিসেবে তিনি একেবারে নিখুঁত।

সুতরাং নেহরু এবার বিপক্ষ-শিবিরে। সুভাষকে তিনি উপদেশ দেন ঠিকই, কিন্তু বিভিন্ন বিবৃতি ও ভাষণে নির্মম আঘাত করতে ছাড়েন না। সুভাষ এক সময়ে দীর্ঘ চিঠি দিয়েছেন, ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন নেহরুর যুক্তিজ্ঞান। দেখিয়েছেন যে, নেহরুর দীর্ঘদিনের বিরুদ্ধতা ব্যক্তিগত আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। নেহরু সামনে নিরপেক্ষতার মুখোশ রেখেছেন, অথচ প্রতিক্ষেত্রে সুভাষের বিরুদ্ধতা করেছেন। নেহরুও আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন।[২২২] কিন্তু সে চেষ্টা নিরর্থক।

নেহরুর অভিযোগ—সুভাষ সহকর্মীদের ওপর অবিচার করে-ছেন। সুভাষ লিখেছেন—মক্কেলের চাইতে উকিলের গলার জোর বেশী হয়, এটা তারই উদাহরণ।

দ্বিতীয় অভিযোগ—বামপন্থা-দক্ষিণপন্থা নিয়ে সুভাষ বেশী চেঁচিয়েছেন। সুভাষের বক্তব্য—হরিপুরায় তো নেহরু আর কৃপা-লনীই ক্ষোভ জানিয়েছেন যে, দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের ওপর জুলুম করে। প্রয়োজনের সময় তিনি যা পারেন, সুভাষের বেলাতেই সেটা অপরাধ?

তৃতীয় অভিযোগ হল--সুভাষের সুনির্দিষ্ট বৈদেশিক নীতি নেই। সুভাষ দাবি করেছেন—ভুল হোক, শুদ্ধ হোক, একটা নীতি তাঁর আছে। সেটা হল বৈদেশিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জাতীয় দাবি আদায়ের ব্যাপারটা স্পষ্ট করে তোলা। কিন্তু নেহরুর বৈদেশিক নীতির ভিত্তি কি? ভাবপ্রবণতা আর উচ্চাদর্শ—এই তো? সুভাষ লিখেছেনঃ তুমি ইহুদীদের ভারতে আশ্রয় দেবার প্রস্তাব এনেছিলে। কিন্তু মনে রেখ, বৈদেশিক নীতি হল বস্তুতান্ত্রিক

ব্যাপার। জাতীয় স্বার্থই ওর নিয়ামক। রাশিয়ার কথা ভাব, তার প্রয়োজনে সে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের সঙ্গেও হাত মেলায়। বৃটেনের দিকেও সে আজ হাত বাড়িয়েছে। এবার দেশের কথা ধরা যাক। তুমি লিখেছ, রাজকোট আর জয়পুর দেশের সব সমস্যাকে ঢেকে ফেলেছে। এটা কেমন কথা? যদি এভাবে এক-একটা রাজ্যের জন্য মীমাংসা করতে হয়, তাহলে এই ঢিমে-তেতালা ছন্দে ছ'শো দেশীয় রাজ্যের জন্য আড়াই শো বছর আমাদের মুক্তি-সংগ্রামকে শিকেয় তুলে রাখতে হবে।

নেহরুর চতুর্থ অভিযোগ--সুভাষ ওয়ার্কিং-কমিটি গঠনে অযথা দেরী করেছেন। সুভাষের বক্তব্য—তোমরাই পন্থ-প্রস্তাব জুড়ে দিয়ে বাধার সৃষ্টি করেছ। দোষটা হল আমার?

পঞ্চম অভিযোগ—বর্তমানে ওয়ার্কিং কমিটি নেই, সভাপতির ইচ্ছেতেই দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য কোনো সভা ডাকা হয় নি। সুভাষ লিখেছেন - এটা একটা অদ্ভুত কথা। বারো জন সদস্য পদত্যাগ করেছেন, অথচ বলা হল সভাপতি সভা ডাকছেন না। এই অবস্থায় সভা ডেকে লাভটা কি হবে?

ষষ্ঠ অভিযোগ—কংগ্রেসের অচল অবস্থার জন্য দায়ী সুভাষ। সুভাষ লিখেছেন, আমি ছিলাম অসুস্থ, গান্ধীজী দূরে। পন্থ প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। আমার ওপর বাধা আরোপিত হল। অথচ এরই মধ্যে তুমি আমার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে শুরু করলে, যদিও জানতে যে, আমি শারীরিক দিক দিয়ে অপটু এখন। তোমার টেলিগ্রাম আমি পাবার আগেই সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে গেল!

সপ্তম অভিযোগ—ফেডারেল স্কীম নিয়ে তিনি বাড়াবাড়ি করেছেন। সুভাষের জিজ্ঞাসাঃ তোমার বন্ধু লর্ড লোথিয়ান জানিয়েছেন, এই ব্যাপারে নেহরুর মতের সঙ্গে কংগ্রেসের অনেক নেতারই মতৈক্য নেই। এই কথাটার মর্মার্থ কি? এটা কিসের ইঙ্গিত? কেউ কেউ আপোষের দিকে ঝুঁকেছেন, তাই না?

অষ্টম অভিযোগ—সুভাষ সভাপতির দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করতে পারেন নি। সুভাষ জানিয়েছেন, সেটা ঘটেছে নেহরুর জন্যই। নেহরু বাক্যবাগীশের মতো বক্তৃতা দিতেন, সভাপতির কাজগুলো জোর করে টেনে নিতেন। এক্ষেত্রে বাধা দিলেই তো বিরোধটা ঘনীভূত হত।

নবম অভিযোগ--তিনি বম্বে ট্রেড ডিসপুট বিল্‌কে বাধা দেন নি। সুভাষ লিখেছেন, অভিযোগটা তাঁকে বিস্মিত করেছে। প্যাটেলকে জিজ্ঞেস করলেই নেহরু সত্যটা নির্ণয় করতে পারতেন।

দশম অভিযোগ—কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার ব্যাপারে সুভাষ বেশী আগ্রহ দেখিয়েছেন। সুভাষ বলেছেন, নেহরু যদি আসাম আর বাংলায় ঘুরে আসেন, তাহলে তিনি তাঁর ভুলটা বুঝবেন।

এর পরেই সুভাষের সেই মোক্ষম প্রশ্নঃ স্পষ্ট করে বল তো, তুমি কি? ভাসাভাসা নয়, ধোঁয়াটে নয়, সোজা ভাষায় বল -- সমাজতন্ত্রবাদী? বামপন্থী? মধ্যপন্থী? দক্ষিণপন্থী? গান্ধীপন্থী? না কি অন্য কিছু?

এর উত্তর কে দেবে?

নেহরু কি নিজেই জানতেন তিনি কি? যাঁর মস্তিষ্কের প্রেরণা রাশিয়া, আর হৃদয়ের টান গান্ধীর দিকে—তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়টা সত্যিই কেমন? কখনো তিনি বলেন, তিনি তত্ত্বগতভাবে সমাজতন্ত্রী, মানসিকতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী। সুভাষ বলেছেন, দ্বিধায় দুলতে পারেন যে-কোনো মানুষ। কিন্তু নেতাকে মনস্থির করতে হয়, কারণ তাঁর দিকে চেয়ে আছেন অগণিত অনুগামীরা।[২২৩]

এই দ্বিধাগ্রস্থ নেহরু সব শেষে স্বীকার করেছেন যে, যদিও তিনি মনে মনে সেদিন সুভাষকে সমর্থন করতেন, গান্ধীজীর পাশে না দাঁড়িয়ে তখন কিন্তু তাঁর উপায় ছিল না।[২২৪]

না পাওয়া যাক নেহরুকে। মীমাংসা করতে হবে গান্ধীজীর সঙ্গেই। নেহরু বহুদিন ধরে সুভাষকে দেখছেন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে।[২২৫]

কিন্তু গান্ধীজী তো জাতির পিতা। তিনি মহাত্মা, তিনি সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে। তিনি হয়ত পথের নির্দেশ দিতে পারবেন।

॥ পনেরো ॥

২৪শে মার্চ গান্ধীজীকে টেলিগ্রাম করে সুভাষচন্দ্র তাঁর দীর্ঘ-মেয়াদী পত্র এবং সংবাদ-বিনিময়ের সূচনা করেন। পরদিন চিঠিতে তিনি গান্ধীজীর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলেন। জানতে চাইলেন, দক্ষিণ ও বামপন্থীদের আনুপাতিক সাম্যের ভিত্তিতে ওয়াকিং কমিটি গঠিত করার ব্যাপারে গান্ধীজীর সম্মতি আছে কিনা। তাঁর আরো প্রশ্ন—গান্ধীজী পন্থ-প্রস্তাবকে কি সুভাষচন্দ্রের প্রতি অনাস্থা বলে মনে করেন?

গান্ধীজী ভাসাভাসা উত্তর দিলেন। তাঁর মতে, সুভাষকেই উদ্যোগটা নিতে হবে। তবে জানালেন, সুভাষ বোধ হয় দেশের জন্য শারীরিক দিক দিয়ে যোগ্য নন। সেক্ষেত্রে তিনি সংবিধান অনুসারে সিদ্ধান্ত নিন।

সুভাষ এবার টেলিগ্রামে জানালেন যে, উভয়ের দেখা হওয়া দরকার। গান্ধীজীর উত্তর এল—রাজকোটের ব্যাপারে তিনি দিল্লীতে ব্যস্ত, সুতরাং দেখা হওয়ার অসুবিধে রয়েছে। ২৯ তারিখে সুভাষ আবার চিঠি দিলেন। এবার বক্তব্য সূত্রের আকারে বিধৃত। প্রথমতঃ, তিনি খেলোয়াড়ী মনোভাব সম্পন্ন, তিক্ততাকে তিনি পুষে রাখেন না। দ্বিতীয়তঃ, পন্থ-প্রস্তাব যেহেতু গৃহীত হয়েছে, তিনি তা মেনে নিতে চান। তৃতীয়তঃ, গান্ধীজীর সামনে রয়েছে দুটো বিকল্প—হয় তিনি সুভাষের সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে সমঝোতায় আসবেন, আর নয় তো, তিনি নিজেই কমিটি গঠন করবেন।

চতুর্থতঃ, এই ব্যাপারে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজী, তবে ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দিল্লী যাওয়া এখন কষ্টকর। পঞ্চমতঃ, এটা বিস্ময়ের বিষয় যে, পন্থ-প্রস্তাবের কপি গান্ধীজীকে এখনো পাঠানো হয় নি। ষষ্ঠতঃ, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রবৃত্তি তাঁর নেই। তবে অসুস্থতার জন্য পদত্যাগ করাটা অর্থহীন। জেলে থাকাকালে তো কোনো কংগ্রেস-সভাপতি পদত্যাগ করেন নি, তাহলে?

৩০শে মার্চে লিখিত চিঠিতে গান্ধীজী স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। জানালেন, যেহেতু সুভাষ পন্থ-প্রস্তাবকে সংবিধান বিরোধী বলে মনে করেন, সুভাষ তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে চলতে পারেন। তবে মৌল ব্যাপারে পার্থক্য যখন রয়েছে, তখন যুক্ত ওয়ার্কিং কমিটি করে লাভ নেই। গান্ধীপন্থীরা সুভাষকে বাধা দেবেন না। যদি তারা সংখ্যালঘু হন, সুভাষের অসুবিধে নেই। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে অবশ্য তাঁরা নিজেদের চেপে রাখবে না।

৩১শে মার্চ সুভাষ লিখলেন—গান্ধীজী জাতীয় নেতা, তিনি দলের নন, কোনো চক্রেরও নন। সুতরাং তিনিই পারেন দু-পক্ষের বিরোধের মীমাংসা করতে। পন্থ-প্রস্তাব মেনে চলার প্রতিশ্রুতি তিনি এবারেও দিয়েছেন। তবে এ-বিষয়ে গান্ধীজীর মতামতটা জানা দরকার। সংগ্রাম সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, চরমপত্র দেওয়াটা উচিত ছিল। গান্ধীজী নিজেও তো কতবার এই ধরণের চরমপত্র দিয়েছেন। সময়টা অনুকূল ছিল; আঠেরো মাসের মধ্যেই ইংরেজ পাততাড়ি গুটোত।

এই ধরণের সংগ্রামে সুভাষ যে-কোনো ভাবেই সাহায্য করবেন। যদি গান্ধীজী মনে করেন, এ-ক্ষেত্রে কংগ্রেস সভাপতি দায়িত্ব অন্য কারো কাছে গেলেই ভাল হত—সুভাষ সানন্দে পদত্যাগ করবেন। রাজকোটের মতো রাজ্যের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম না করে সেটা করা দরকার ব্যাপক আকারে—সমগ্র দেশের জন্যই।

২রা এপ্রিল গান্ধীজী যে উত্তর দিয়েছেন, তাতে তাঁর সততা সম্বন্ধেই প্রশ্ন জাগে। প্রথমতঃ তিনি চ্যালেঞ্জের মতোই বলেছেন, তুমি তোমার কমিটি গঠন কর এবং তোমার কর্মসূচী কংগ্রেস অধিবেশনে রাখ। যদি তুমি জয়লাভ কর, তোমার কোনো অসুবিধে নেই। তা না হলে তুমি পদত্যাগ করো।

সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি দুটো আপত্তি তুলেছেন : কংগ্রেস দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। আর বাতাসেও হিংসের গন্ধ রয়েছে। এই অবস্থায় সংগ্রাম চলে না। রাজকোটের ব্যাপারেও দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য রয়েছে। তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তিনি মনে করেন সেটাই ন্যায়সঙ্গত।

একই তারিখে তিনি টেলিগ্রামেও সুভাষকে মনোমত কমিটি গঠন করে কর্মসূচী কংগ্রেসে পেশ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

এরপর ৫ই এপ্রিলের মধ্যে গান্ধী-সুভাষের মধ্যে সাতখানা টেলিগ্রামের আদান-প্রদান হয়েছে। ৬ তারিখে সুভাষ আবার চিঠি লিখেছেন, গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বেই বর্তমান অনৈক্য দূর হতে পারে। এই সঙ্কট-সময়ে একমতাবলম্বী কমিটি গঠন করার অর্থই হল সঙ্কটকে ঘনীভূত করা। সুভাষ জাতীয় সঙ্কট-লগ্নে উদারভাবে হাত মেলাতে রাজী—সুতরাং মিশ্র কমিটি গঠনে অসুবিধে কোথায়?

এই ব্যাপারে গান্ধীজীর আপত্তিটা আসলে কোথায়? এটা কি নীতিগত কারণে? নাকি গান্ধীবাদীরা কমিটিতে বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব চাইছেন? যদি তাই হয়, সুভাষ ব্যাপারটা বিবেচনা করতে রাজী।

তাঁর বক্তব্য হল— গান্ধীজীকে কংগ্রেসের দু-পক্ষ সম্বন্ধে বলেছেন, এরা একেবারে পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু এই বিরোধ কি ব্যক্তিগত, না কি আদর্শগত? যদি ব্যক্তিগত হয়, সেটা সাময়িক ব্যাপার। বৃটেনে তো সঙ্কট-সময়ে সর্বদলীয় সরকার হয়। এক্ষেত্রে বাধাটা কোথায়? আর যদি এটা আদর্শগত হয়ও, স্বীকার করতে হবে, দুপক্ষের অমিল যত, মিলটা তার চাইতে বেশী।

গান্ধীজী লিখেছিলেন, দেশে আন্দোলন শুরু করার মতো অহিংস পরিবেশ নেই। কিন্তু সুভাষ লিখেছেন, আপনি তো রাজকোট প্রভৃতি জায়গায় আন্দোলন করছেন। দেশীয় রাজ্যগুলো অহিংস আন্দোলনে একেবারেই অনভিজ্ঞ। তবু যদি তাদের নিয়ে এটা হতে পারে, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর বৃটিশ-ভারতের অধিবাসীদের দিয়ে তা হয় না ?

পন্থ-প্রস্তাবে দুটো অংশ ছিল—গান্ধীজীর ইচ্ছে অনুসারে কমিটি গঠন করতে হবে এবং তাঁর আস্থা কমিটিকে অর্জন করতে হবে। যদি সুভাষ কমিটি গঠন করেন, গান্ধীজী কি আস্থা জানাবেন ? সুভাষ আরো লিখেছেন, তিনি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চান না। বিশেষ করে, গান্ধীজী যেহেতু দেশের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব, তাঁর আস্থা অর্জন না করতে পারলে সুভাষ বিবেকের নির্দেশেই সরে যাবেন।

সুভাষ এরপর তিনটে প্রস্তাব দিয়েছেন :

১. আপনি নিজে কংগ্রেসে ফিরে এসে সব দায়িত্ব নিন।

২. অথবা সংগ্রাম শুরু করুন। তাতে ক্ষমতা বা পদের ব্যাপারটা আর থাকছে না।

৩. আর নয়ত, আমার প্রতি আগাম আস্থা জানান, আমার গঠিত কমিটিকে মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিন।

৭ই এপ্রিলের টেলিগ্রামে সুভাষ চেয়েছেন গান্ধীজীর সঙ্গে বৈঠক। তিনি জানিয়েছেন, এর জন্য তিনি ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে দিল্লী যেতে প্রস্তুত। কিন্তু সেদিনই গান্ধীজী টেলিগ্রামে জানিয়েছেন যে, তিনি রাজকোট চলে যাচ্ছেন।

১০ তারিখে সুভাষ পুরানো প্রসঙ্গ তুললেন। লিখলেন, কংগ্রেসে দুর্নীতি আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা মন্ত্রীত্ব-গ্রহণের ফলেই এসেছে। সংগ্রামে নামলেই সেটা অতীতের ব্যাপার হয়ে যাবে। অহিংসার ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেস বিরোধীরা যদি সেটা বাড়িয়ে তোলে, তাহলে কি কংগ্রেস আন্দোলন বন্ধ করে রাখবে ? তিনি জানালেন গান্ধীজীর সামনে চারটে বিকল্প আছে —

১. সংগ্রাম শুরু করা।

২. কংগ্রেসে ফিরে আসা।

৩. কমিটি গঠনে সুভাষকে অগ্রিম আস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

৪. নিজেই কমিটি গঠন করা।

রাজকোট থেকে গান্ধীজী ১০ তারিখে লিখলেন, আন্দোলন করা এখন অসম্ভব। আর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের মিলনের সুযোগ নেই কোনো। সহযোগিতা সম্ভব শুধু সামাজিক, নৈতিক বা পৌরশাসনের ব্যাপারেই।[২২৬]

১৩ তারিখের চিঠিতে সুভাষ ঐক্যের ওপরে জোর দিলেন। জানালেন, তাঁদের পার্থক্য আছে—কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থেই সেটা উহ্য রাখা দরকার। পন্থ-প্রস্তাবের ব্যাপারে তাঁর বাধার কথা তুলে তিনি গান্ধীজীকে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করলেন।

এরপরে ১৪ এবং ১৫ তারিখে তাঁদের মধ্যে চারটে টেলিগ্রামের আদান-প্রদান হল। ১৫ তারিখে সুভাষ জানালেন, তিনি এক-মতাবলম্বী কমিটি গঠনে অক্ষম। সুতরাং গান্ধীজীকেই দায়িত্ব নিতে হবে। ১৭ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে পাঁচটি টেলিগ্রাম এল-গেল। ২০ তারিখে সুভাষ জানালেন, তিনি চান গান্ধীজী সঙ্কট মোচনের দায়িত্ব নিন। কলকাতায় আসার আগে গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা করলে ভাল হয়।[২২৭]

সুভাষ মোট সতেরোটি টেলিগ্রাম এবং নয়টা চিঠি লেখেন। প্রত্যেক চিঠিতেই সুভাষ ব্যক্ত করেছেন তাঁর সদিচ্ছা, চেয়েছেন সহযোগিতা, এগিয়ে দিয়েছেন অকাট্য যুক্তি। সত্যিই, তাঁকে সমর্থন না করে পারা যায় না।[২২৮] কিন্তু গান্ধীজীর কাছে তখন যুক্তির প্রয়োজন নেই, জাতীয় স্বার্থও পরের কথা। আগে সুভাষকে উৎখাত করতে হবে।[২২৯]

সমগ্র দেশবাসী জানতেন যে, গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের বোঝাপড়া চলছে। অধীর উত্তেজনায় সবাই ফলাফলের প্রতীক্ষা করছিলেন।

অনেকেরই আশঙ্কা ছিল সুভাষ পদত্যাগ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ সে কথা ভেবে ২রা এপ্রিল সুভাষকে লিখেছিলেন ঃ সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে—এমন অনুকূল অবসর যদি দ্বিধা করে হারাও, তাহলে আর কোনোদিন ফিরে পাবে না·········
মহাত্মাজী যাতে শীঘ্রই তাঁর শেষ বক্তব্য তোমাকে জানান দৃঢ়ভাবে সেই দাবী করবে। যদি তিনি গড়িমশি করেন, তাহলে সেই কারণ দেখিয়ে তোমরা পদত্যাগ করতে পারবে।[২৩০]

কতটা উত্তেজিত হয়ে কবি তাঁর অরুচি সত্ত্বেও রাজনীতির ব্যাপারে ঢুকে পড়েছিলেন, সেটা চিঠিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমনকি নেহরুও গান্ধী-পন্থা মেনে নিতে পারেন নি। ১৭ই এপ্রিল তিনি গান্ধীজীকে লিখেছিলেন যে, সুভাষকে বিতারিত করার চেষ্টাটা সঙ্গত নয়।[২৩১] শেষ পর্য্যন্ত নেহরুর আগ্রহেই গান্ধীজী সোদপুরে সুভাষের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। এরপর সুভাষের সঙ্গে প্যাটেল-প্রভৃতিরও আলোচনা হল। কিন্তু ফল ফলল না।

সুভাষ বলেছেন—সোদপুরে নতুন সমস্যা দেখা দিল। বলা হল, পুরানো ওয়ার্কিং কমিটির সবাইকে নিতে হবে। আমরা জানতাম, নতুন চারজনকে নেওয়া যাবে, মতভেদ রয়েছে শুধু নাম নিয়ে। কিন্তু গান্ধীজী যখন নতুন প্রস্তাবটা সমর্থন করলেন, আমরা বিস্মিত হলাম। আমাকে বলা হল যে, পরে অবশ্য আরো দুজনকে নেওয়া যাবে। এটাই নতুন সদস্যদের সর্বোচ্চ সংখ্যা। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, এই দুজনকে প্রথম থেকে নেওয়া যাবে না। তখন আমি দুটো নাম দিলাম, দুটোই প্রত্যাখ্যাত হল। আমি চাইলাম, আগের মতো দুজন সম্পাদক রাখতে, একজন কলকাতার জন্য। এই প্রস্তাবও গৃহীত হল না।[২৩২]

এবার বিরোধের পাত্র পূর্ণ হল। সুভাষ পদত্যাগ করলেন। সেদিন দেখা গেল গান্ধীপন্থীদের হিংস্র মুখগুলোতে সাফল্যের আনন্দ জেগেছে। বিক্ষোভে তখন ফেটে পড়েছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের

উদ্বেল জনতা। অথচ সুভাষ তাঁদের সংযত করেছেন। অশান্ত মানুষের মাঝখান দিয়ে ওই নেতাদেরই পৌঁছে দিয়েছেন নিরাপদ আশ্রয়ে।[২৩৩]

মীমাংসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সুভাষ। কিন্তু গান্ধী-জীর ক্রুরতাই তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে।[২৩৪] গান্ধীজী তখন ন্যায়নীতির জীবন্ত প্রতীক আর নন। এটাই স্বাভাবিক। স্বার্থে লাগলে বৈরাগীর গৈরিক বসনের অন্তরাল থেকে রক্ত-মাংসের আসল মানুষটা বেড়িয়ে পড়ে। গান্ধীজীকে যারা সত্য আর পবিত্রতার বিগ্রহ বলে জানতেন, তাঁরা এবার দেখলেন এক বীভৎস মূর্ত্তিতে।[২৩৫] গান্ধীজী জিতেছেন ঠিকই, কিন্তু বড্ড বেশী দাম দিয়ে। নিজেকে তিনি ছোট করে ফেলেছেন, এত মহৎ মানুষটা নিজেকে বড্ড নীচে নামিয়ে নিয়েছেন।[২৩৬] জঘন্য চক্রান্ত-দ্বারা সুভাষকে সরানো হল বটে, কিন্তু চক্রান্তটা গণতন্ত্রের নীতিকেই হত্যা করেছে। তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এসেছিলেন। অথচ নিজেদের মানুষের অবিচারেই তাঁকে সরে যেতে হল।[২৩৭]

একথা বলা হয়েছে যে, তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছে আগের ওয়ার্কিং কমিটির।[২৩৮] কিন্তু ইতিহাসের বিচারে অন্যেরা গৌণ। সংঘাতটা মূলতঃ গান্ধীজীর সঙ্গেই। তাঁর শিষ্যরা গুরুবাদী আদর্শে প্রতিশোধ-স্পৃহায় মেতেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের সাবালকত্ব এসেছে। তখন গান্ধীজী আর গান্ধীবাদ অবহেলায় পরিত্যক্ত।[২৩৯]

অবশ্য সুভাষকে না সরিয়ে ওঁদের সেদিন উপায় ছিল না। ক্ষমতার পার্থক্য ওঁরা বুঝেছেন, ভবিষ্যতের চিন্তা ওঁদের একত্রিত করেছিল। তার চাইতে বড় কথা, তিরিশের দশকেই সুভাষ কং-গ্রেসকে যেভাবে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাইছিলেন, এত-দিনে সেই দুশ্চিন্তার অবসান ঘটল। আপোষের পথ এখন পরিষ্কার।[২৪০]

॥ ষোল ॥

সুভাষের মর্য্যাদাবোধের প্রশংসা করে আশীর্বাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নতুন প্রেরণায় তাই এবার কংগ্রেসের ভেতরেই সুভাষ গড়লেন ফরোয়ার্ড ব্লক। তিনদিনের মধ্যেই এই চমক—কলকাতার ব্রড্‌ওয়ে হোটেলে নতুন দলের জন্ম হল নতুন উদ্দীপনার মধ্যে।[২৪১]

সুভাষ জানালেন, সব প্রগতিশীল এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগ্রাম শুরু করতে হবে। ফরোয়ার্ড ব্লক হবে তার কেন্দ্রবিন্দু।

সুভাষ আরো জানালেন, তিনি কংগ্রেসের অনুগত সৈনিক। সেইজন্যই এটা কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন নয়। কংগ্রেস-সদস্যরাই এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন।

তাঁর মতে, ফরোয়ার্ড ব্লক ইতিহাসের সৃষ্টি, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এর আবির্ভাব। এর উদ্দেশ্য পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া।

২২শে জুন বোম্বেতে ঐক্য সম্মেলন হল। তার ফলে বাম-ঐক্য কমিটি গঠিত হল – যার সদস্য হল ফরোয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল এবং ন্যাশনাল ফ্রণ্ট-(পরবর্তী কালের কমুনিষ্ট পার্টি)। দক্ষিণপন্থী জাতীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তবু কিন্তু তেমন সাড়া জাগানো গেল না।

অবশ্য সংঘর্ষটা আরো তীক্ষ্ণ হল এবারে।

জুন মাসে ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নেয় যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলো সমালোচনা করতে পারবে না। এমন কি, মন্ত্রীদের কোনো অন্যায় কাজ নিয়েও প্রকাশ্যে আলোচনা চলবে না।

সুভাষ ও তাঁর অনুগামীরা এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। ৯ই জুলাই দেশ-জুড়ে প্রতিবাদ-দিবস পালিত হল। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভি-যোগ এনে সুভাষের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হল। সুভাষ এক দীর্ঘ চিঠিতে চমৎকার যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিলেন।[২৪২] সুভাষ জানালেন, কংগ্রেস সংগ্রাম করছেন গণতন্ত্রের জন্য। কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক আদর্শ কংগ্রেসেই থাকবে না? শব্দটা কি তাহলে শুধু ইংরেজের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্রেই উচ্চারিত হবার জন্য, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের জন্য নয়?

বলা-বাহুল্য সুভাষের বক্তব্যকে নস্যাৎ করা অসম্ভব।[২৪৩] কিন্তু গান্ধীপন্থীরা ততদিনে যুক্তিবাদকে বিসর্জন দিয়েছেন। সুভাষকে বাংলা প্রদেশ-কংগ্রেসের সভাপতি-পদ থেকে বহিষ্কৃত করা হল এবং তিন বছর নির্বাচিত কোনো পদের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হল। খসড়াটা রচনা করলেন গান্ধীজী স্বয়ং।[২৪৪] গান্ধীজীর মতে, অবশ্য শাস্তিটা অপরাধের অনুপাতে সামান্যতম ('mildest possi-ble'). শুধু তাই নয়, তিনি এণ্ড্রুজকে লিখলেন যে, সুভাষের সংশোধন দরকার। সে যেন একটা পরিবারের বেয়াড়া ছেলে ('spoilt child').

এই ধৃষ্টতা সত্যিই অমার্জনীয়।[২৪৫]

ইতিমধ্যেই ফরোয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। ব্লক নাকি সুবিধেবাদী, আর ফ্যাসীবাদী। নেহরু স্বয়ং এই দলটার সংগঠনে ফ্যাসিবাদের গন্ধ পেয়েছেন।[২৪৬] সুভাষ লিখলেন, সুবিধেবাদের অভিযোগটা টেঁকে না। ব্লককে সংগ্রাম করতে হচ্ছে দুটো রণাঙ্গনে—একদিকে ইংরেজ অন্যদিকে গান্ধীচক্র। সুবিধেবাদীরা তো এই কষ্টস্বীকার না করে গান্ধীর ছায়ায় আশ্রয় নেবে। আর ভারতের পটভূমিকায় ফ্যাসীবাদের অর্থ কি? যদি এটা হিটলারী-শাসনের মতো একনায়কতন্ত্রবাদ বোঝায়, সেটা তো মিলবে গান্ধী-শিবিরেই।[২৪৭] অভিযোগটা কি মিথ্যে? ত্রিপুরীতেই

তো শেঠ যমুনালাল গান্ধীজীকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাঞ্জাবের সদস্যরা উল্লাসে হেঁকেছেন—'হিন্দুস্থান-কা হিটলারকী জয়'। প্রতিবাদ করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকেও। তিনি লিখে-ছিলেনঃ স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই বেদীতেই ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠল।[২৪৮]

কবি ইতিপূর্বে নতুন সভাপতি প্রসাদকে 'কঠোর এবং অবিবে-চনাপ্রসূত' কার্য্যের ফলে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ২০শে ডিসেম্বর গান্ধী-জীকে তার করে সুভাষের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে অনুরোধ জানালেন। গান্ধীজী এণ্ড্রুজকে জানালেন যে, সুভাষকে শাসন করা দরকার। তার রাজনীতিতেও রয়েছে মৌল পার্থক্য। এটা দূর করা অসম্ভব।

অবশ্য সুভাষের বক্তব্য ও সম্পাদকীয় (ফরোয়ার্ড ব্লক) পত্রি-কায়) নিবন্ধ ক্রমে গান্ধীপন্থীদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল। অভি-যোগ উঠেছে, তিনি কাজের কাজ কিছু করেন নি, শুধু দক্ষিণপন্থী-দের আক্রমণ করেছেন দিনের পর দিন।[২৪৯] কিন্তু নিরপেক্ষ ইতি-হাস তো বলে অন্য কথা। গান্ধীচক্র তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে বহুদিন ধরে, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁকে প্রত্যাঘাত হানতে হয়েছে।[২৫০]

অবশ্য নিষ্ক্রিয় জড়তা আর আপোষকামী সুখস্বপ্ন থেকে দেশ-বাসীকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার দরকার ছিল। অবশ্য-প্রয়ো-জনীয় ছিল জাতীয় নেতৃত্বের ভ্রান্তি-সংশোধনের। সেইজন্য সুভাষ অক্লান্তভাবে সারা দেশে বক্তৃতা করেছেন, দলীয় সংগঠন দৃঢ় করেছেন আর অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয় লিখেছেন দিনের পর দিন। য়ুরোপে যুদ্ধের ছায়া ঘনিয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া দর-কার ছিল। দক্ষীণপন্থীদের নিষ্ক্রিয়তা তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। ২৬শে আগস্ট তিনি লিখেছেন : যুদ্ধ ঘনালে বৃটেনকে সোজা ভাষায়

জানিয়ে দিতে হবে যে, এ-দেশ থেকে কোনো সাহায্য মিলবে না। ওয়াকিং কমিটি যুদ্ধে জড়াতে নারাজ হয়েছে—কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের এই যুদ্ধে জড়ালে তাতে চূড়ান্ত বাধা দিতে হবে।

যুদ্ধ বাধতেই দেখা গেল কংগ্রেসের সঙ্কট। কোনো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে কংগ্রেস পারলই না। শুধু মন্ত্রীরা বৃটেনের যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করলেন। সুভাষ লিখেছেন—এটা যথেষ্ট নয়। অবশ্য গান্ধীজী তো নিঃসর্ত্ত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বৃটেনের দুঃসময়ে তাকে বিব্রত করা নাকি নৈতিক অপরাধ। তিনি বৃটেনের পতনের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা চান না।[২৫১] কংগ্রেসের তাত্ত্বিক নেতা নেহরুর মতও তাই। গণতন্ত্র আর ফ্যাসিবাদের মধ্যে এই সংগ্রামে আমাদের সহানুভূতি গণতন্ত্রের (অর্থাৎ বৃটেনের) দিকে।[২৫২] আজাদ জানিয়েছেন, এই তত্ত্বগত কারণে কংগ্রেসের সহানুভূতি বৃটেনের দিকেই ছিল।[২৫৩]

কোথায় গেল হরিপুরা আর ত্রিপুরীর কংগ্রেস-সিদ্ধান্ত? হরিপুরায় এই যুদ্ধকে দেখা হয়েছে নিছক সাম্রাজ্যবাদীদের সংঘর্ষ হিসেবে। আর ত্রিপুরীতে বৃটেনের নীতিকে গণতন্ত্রের অস্বীকৃতি ('deliberate betrayal of democracy') হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু রাতারাতি বৃটেন গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক হয়ে গেল। গণতন্ত্রের স্বার্থেই তাকে নাকি বাঁচাতে হবে; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন আপাততঃ মুলতুবী থাক। অন্ততঃ নেহরু বৃটেনের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না।[২৫৪]

অথচ সুভাষ এই যুদ্ধের কথাই বলে এসেছেন ১৯২৮ সাল থেকে। তখন থেকেই নেতৃত্ব আর জাতিকে এই যুদ্ধের সুযোগটা নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করেছেন। যখন সত্যিই সেই যুদ্ধ এসে পড়েছে, সুযোগ নষ্ট করাটা হবে মূঢ়তা। আঘাত করতে হবে শত্রুর দুর্বলতম মুহূর্তেই। মনে পড়ে না সেই মহাগুরু, বীর-সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠ—লোহাকে আঘাত কর উত্তপ্ত অবস্থাতেই?

অবশ্য, কংগ্রেস-নেতারা কিছু যে করেন নি, তা নয়। তাঁরা বৃটেনের কাছে এই যুদ্ধে বৃটেনের উদেশ্য জানতে চেয়েছেন। চমৎকার! পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী-শিরোমণি বৃটেনকে নেতাদের কাছে তার যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলতে হবে। সব কিছুর নাকি সীমা আছে। তবে সীমা কি নেই ন্যাকামোর?

আর একটা কাজও তাঁরা করেছেন। তাঁরা গণপরিষদ গঠনের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু তার আগে তো হবে অস্থায়ী সরকার। সেই সরকারই ডাকতে পারেন গণপরিষদ।[২৫৫] গাঁটছড়া বেঁধে রেখে বিপ্লবী বুলি শোনানোর এই আত্মপ্রতারণা কেন?

সুভাষ লিখেছেন, আর আত্মপ্রতারণা নয়। এবার সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলার দিন এসেছে। চরকা কেটে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার সময় আর নেই। চরকার স্থান হবে অর্থনীতিতে, স্বাধীনতা সংগ্রামে ওই অস্ত্র হাতে নিয়ে আর লড়াইয়ের কথা নয়।[২৫৬] এবার শুরু হোক শেষ সংগ্রাম, এবার আর থামাথামি নেই। আর চৌরিচৌরা নয়, হরিজন-আন্দোলন নয়, গান্ধী-আরউইন চুক্তি নয়। এবারে লড়াই শেষ হোক স্বাধীনতার স্বর্ণদ্বারে, এই মৃত্যু-কঠিন আত্মনিবেদন এনে দিক নতুন জীবনের স্বাদ।

সংগ্রাম-ক্ষেত্রে সুভাষের আপোষ নেই। নেই কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব। তাই অনুশীলন-দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে স্থির হয়েছিল, এই বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিতে হবে, সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা করতে হবে অনিবার্য্য কারণেই।[২৫৭] এমন কি, তিনি এই জন্য বিদেশী-সাহায্য নিতেও দ্বিধান্বিত ছিলেন না। ম্যাকিয়াভেলী বা কৌটিল্যের যুগ থেকে প্রচলিত তত্ত্বই তাঁর মূলমন্ত্র—শত্রুর শত্রু হল মিত্র।[২৫৮]

অথচ গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকার মাধ্যমে জানিয়েছেন, সুভাষ সত্যি কথাই বলেছেন—তিনি আপোষের পথ খুঁজছেন। যদি সম্মানের সঙ্গে হয়, আপোষ তিনি মেনেও নেবেন। তাঁর কোনো তাড়া নেই ('I am in no hurry')। এই আপোষ সত্যাগ্রহে অবশ্যম্ভাবী।[২৫৯]

এই আপোষ-নীতির বিরুদ্ধেই তিনি আকৈশোর লড়াই করেছেন। তাই ১৯৪০ সালে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল রামগড়ে, কাছাকাছি তিনিও আপোষ-বিরোধী অধিবেশন বসালেন। জানালেন, এবার শেষ সংগ্রাম শুরু করতেই হবে। ৬ই এপ্রিল থেকে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। অবশ্য এখানেই বাম-ঐক্য কমিটি ভেঙে গেল। র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল আগেই সরে গিয়েছিল, এবার পিছিয়ে গেল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল আর ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট।

সুভাষ বুঝলেন, এবার একাই চলতে হবে, পথ হয়ে যাবে আরো দুর্গম।[২৬০] কিন্তু তাতে কি? বিপ্লবী কি সঙ্গী না পেলে পিছিয়ে যায়? চলার পথে কে সঙ্গে থাকবে, কে বিদায় নেবে—এই খোঁজ নিলে কি চলে? লাভ-ক্ষতি-টানাটানির হিসেব নিয়েও লাভ নেই। অগ্রপথিককে এগিয়েই যেতে হবে। পেছনে পড়ে থাকবে সব হিসেব—লাভালাভৌ, জয়াজয়ৌ।

এই পথে একবার যাত্রা শুরু করলে, আর ফেরা যায় না কোনোদিন।[২৬১] ঘর-সংসার, স্নেহ-মমতার অসংখ্য বন্ধন তখন তুচ্ছ বলে মনে হয়।

রামগড় সেই পথের নিশানাই দিয়েছে।

কাছাকাছি দুই শিবির। গান্ধীবাদীরা কংগ্রেসের অধিবেশনে জনতার জোয়ার এনেছিল। কিন্তু প্রবল বর্ষণে সব ভেসে গিয়েছে। আকাশে তখন প্রলয়ের ডাক।

আগের দু-বারের রাষ্ট্রপতি আজ আর কংগ্রেসের কেউ না। তবু স্বকীয় আভিজাত্যবোধেই তিনি কংগ্রেস-নেতাদের আশ্রয় দিতে চেয়েছেন, জানিয়েছেন উদার আহ্বান।

অস্বীকার করি না, দুটো ধারাই এগিয়ে চলেছিল। দুই আদর্শ পথ খুঁজে নিয়েছিল দুভাবে।[২৬২] তবু এতদিনে আগের যোগটা একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। সুভাষ তাই রামগড়ের জনসমুদ্রের সামনে ঘোষণা করলেন—এই আপোষহীন, এই কঠিন-কঠোর সংগ্রামের

মধ্য দিয়েই আমরা ইতিহাস গড়ব। আমাদের এই আত্মত্যাগই পৌঁছে দেবে আমাদের চরম সিদ্ধিতে।

এবার আর ফেরা নয়। হয় মুক্তি, নয়ত মৃত্যু।

॥ সতেরো ॥

সুভাষ কোনোদিনই গান্ধীজীকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করেও সুভাষ গান্ধীজীকে অদ্বিতীয় নায়ক হিসেবে প্রণতি জানিয়েছেন। সত্যিই তো, এমন করে কে কবে মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করে রাখতে পেরেছেন? আর কার ডাকে এমন করে ছুটে এসেছে মুক্তি-পাগল ভারতবাসী? না, এমন করে কোনো মানুষই তাঁর দেশবাসীকে বশীভূত করতে পারেন নি।[২৬৩] সুভাষ নিজেও জানেন, তিনি ডাকলে হাজারে হাজারে ছুটে আসবে, কিন্তু ওই ক্ষীণতনু বৃদ্ধের আহ্বানে উদ্বেল হয়ে উঠবে মুমুক্ষু ভারত। কারণ, তিনি একটা যুগের ওপর নিজের নামটি অঙ্কিত করে রেখেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বে, তাঁর ত্যাগে, তাঁর অনুপম মহত্ত্বে, উদার বিশ্বপ্রীতিতে।[২৬৪]

দেশের মানুষের কাছে তিনি পেয়েছেন অবিমিশ্র আনুগত্য, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তিনি যা পেয়েছেন, নেতার তা প্রাপ্য নয়। এই এই আত্মসমর্পণ মানুষ শুধু ধর্মগুরুর কাছেই করে। অথচ রাজনৈতিক নেতা হয়েও তিনি তা পেয়েছেন অনায়াসে।[২৬৫]

অথচ এই সুযোগটা পেয়েও তিনি কি করলেন? তাঁর একটা কথাতেই দেশে আগুন জ্বলে যেতে পারত। তিনি তা করলেন না।

সোনার কাঠি-রূপোর কাঠি ছিল তাঁরই হাতে, অথচ তিনিই জাতিকে নির্জীব তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে রাখলেন দীর্ঘদিন ধরে।

কংগ্রেস শুরু থেকে আবেদন-নিবেদনের সহজ পথ নিয়েছিল।[২৬৬] গান্ধীজীর আবির্ভাবে তাতে সহসা এসেছিল সংগ্রামী প্রাণ-স্পন্দন। কিন্তু গান্ধীজী এতবড় সম্ভাবনাকে হেলায় নষ্ট করলেন। ১৯২১ থেকে ১৯৪০ পর্য্যন্ত মাত্র দুটো আন্দোলন ডাকলেন আর তেমনি থামিয়েও দিলেন আকস্মিকভাবে (আর একটি মাত্র আন্দোলনের ডাক তিনি দিয়েছিলেন ১৯৪২ সালে, কিন্তু তার নেতৃত্ব যেমন দিতে পারেন নি, পরে তার দায়িত্বও অস্বীকার করেছেন)। এমন করে প্রত্যাশার মৃত্যু আর বোধ হয় কখনো ঘটে নি।

সুভাষের দুঃখ আর অভিমান এই জন্যই।

অথচ তিনি যখন দিতে চাইলেন বিকল্প নেতৃত্ব, গান্ধীজীই বাধা দিলেন। তাঁর কিংবদন্তী-তুল্য সততা-সারল্য বিসর্জন দিয়ে শিষ্যদের নিয়ে তিনিও মেতে উঠলেন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে। অনুপম এক চরিত্রে এতদিন পরে লাগল মালিন্যের ছোঁয়া। ধরণীর ধুলো লাগল তাঁর দৈব-সত্তাতে।

ব্যক্তিগত কথা বাদ দিলেও দেশের কত বড় ক্ষতি তিনি করলেন, সেটা তিনি জানলেন না। ইংরেজ বেকায়দায় পড়েছে। বিশ্বযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে তার অস্তিত্ব নিয়েই জেগেছিল সঙ্কট। সুভাষ জানতেন, এটাই হল সময়। বাইরে সে যত ঘা খাবে, এখানে তার বজ্রমুষ্টি ততই হবে শিথিল। সুতরাং আর দেরী নয়। শুরু করতে হবে ভারতবাসীর শেষ সংগ্রাম।

কিন্তু গান্ধীজী রাজী নন। বৃটিশের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তিনি চান না স্বাধীনতা। চান না তাঁর ভক্ত-শিষ্যরাও।

সুতরাং পথ চিরদিনের জন্য আলাদা হয়ে গেল। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও দুজনে বহুকাল পাশাপাশি ছিলেন। হরিপুরা তাঁদের কাছে এনে দিয়েছিল। কিন্তু রামগড় তাঁদের সরিয়ে দিল, দিল চিরদিনের জন্য।

অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ সুভাষকে নেতৃপদে বরণ করেছিলেন।[২৬৭] অবশ্য তখন জানিয়ে ছিলেন যে, সুভাষের রাস্ট্রীক সাধনার আরম্ভক্ষণে দূর থেকেই তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে সংশয় আর দ্বিধা জেগেছিল মনে। কিন্তু যত দিন কেটেছে, সংশয়ের আবিলতা গেছে মুছে। মধ্যদিনের প্রখর আলোয় সুভাষ এখন ভাস্বর, প্রদীপ্ত। সুভাষের মধ্যে তিনি পেয়েছেন কঠিন জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তাঁকে অভিভূত করে নি। কবি বলেছেন : দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি।

সত্যিই, সুভাষ এই অপরাজেয় প্রাণশক্তির প্রতীক। তিনি সর্বাবয়ব বিপ্লবেরই প্রতিমূর্তি।[২৬৮] বাধার কাছে তাই তিনি কোনো-দিনই নতি-স্বীকার করেন নি। গান্ধীচক্রের প্রতিরোধে গতি যখন রুদ্ধ, তিনি তখনো সন্ধান করেছেন বিপদ-সঙ্কুল নতুন পথ। খুঁজেছেন মুক্তির উপায়।[২৬৯]

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : আজ আমার শেষ কর্ত্তব্যরূপে বাংলা-দেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণশক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক— কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।[২৭০]

সত্যি, দুঃখভোগের দায় তো তাঁরই। তাই তো সম্মানের উচ্চাসন ছেড়ে নেমে এসেছেন দুঃখের সন্ন্যেসী।

পথ এবার দুর্গম-বন্ধুর। মৃত্যুকে বাজী রেখেই তবে এগোতে হবে। পেছনে পড়ে থাকবে সব স্মৃতি, সব বন্ধন। থেকে যাবে জননী-জন্মভূমি। তারপর? তারপরের ইতিহাস তো রূপকথা ॥

॥ সূত্রনির্দেশ ॥

১. Ronald Segal—Crisis In India, p. 110.

২. M. N. Roy--Disintegration of A Priestly Family—Radical Humanist, 7. 2 , 54.

৩. শঙ্করীপ্রসাদ বসু—সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং—মুখবন্ধ।

৪. বনফুল—নেতাজী স্মারক বক্তৃতা, ১৯৬৮—সত্যনিষ্ঠায় অনন্য নেতাজী—চরিত্র, পৃঃ ১৯।

৫. তিনি বলেছেন : There is nothing that lures me more than a life of adventure away from the beaten track and in search of the unknown. In this life there may be suffering, but there is joy as well ; there may be hours of darkness, but there are also hours of dawn. To this path I call my countrymen.—Dilip Kumar Roy—The Subhas I Knew, pp, 78-79.

৬. Kitty Kurty—Subhas Chandra Bose : As I Knew Him, pp 3—5.

৭. সমর গুহ—নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা, পৃঃ ৯।

৮. তরুণের স্বপ্ন, পৃঃ ৭৬।

৯. ঐ, পৃঃ ৪৩।

১০. An Indian Pilgrim, P, 32.

১১. পত্রাবলী, পৃঃ ৫০।

১২. Hugh Toye—The Springing Tiger, p. 18.

১৩. তরুণের স্বপ্ন, পৃঃ ১৭।

১৪. নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী—নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৩।

১৫. An Indian Pilgrim, pp. 70—71.

১৬. তরুণের স্বপ্ন, পৃঃ ৬৯।

১৭ পবিত্রকুমাব ঘোষ—সুভ ষচন্দ্র, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩০।

১৮. Crossroads, p. 102.

১৯. Ibid, pp. 137--38.

২০. Though there may be no immediate, tangible gain, no suffering, no sacrifice is ever futile. It is through suffering and sacrifice alone that a cause can flourish and prosper and in every age and clime, the eternal law prevails—the blood of the martyr is the seed of the church.

In this mortal world, everything perishes and will perish—but ideas, ideals and dreams do not One individual may die for an idea—but that idea will, after his death, incarnate itself in a thousand lives. That is how the wheels of evolution moves on and the ideas, ideals and dreams of one generation are bequethed to the next...

To my countrymen I say—"Forget not that the greatest curse for a man is to remain a slave. Forget not that the grossest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law—you must give life if you want to get it. Aud remember that the highest virtue is to battle against inequity, no matter what the cost may be."—Netaji Speakes, Vol. I. (Jayasree Publication), pp. 135--136.

২১. 'Netaji's one ideal of life was service to his country, selfless and self-acrificing. This remarkable incident clearly indicated the trend of his mind'.—A. C. Chatterjee—India's Struggle For Freedom.—p. 151.

২২. Ibid, p. 224.

২৩. Lothar Frank—Epilogue—A Beacon Across Asia, p 250.

২৪. Hugh Toye—Ibid, P. 59.

৩৫. Important Speeches And Writings of Subhas Bose, J. S. Bright (Ed.), p. 84.

২৬. অনিল রায়—নেতাজীর জীবনবাদ, ভূমিকা।

২৭. Dr. Atindra Nath Bose—S udies In Bengal Renaissance, pp. 120—21.

২৮. Surindar Suri—Politics And Society In India, p. 115,

২৯. Discovery of India, p. 472

৩০. "In spite of closest association with him for many years, I am not clear in my own mind about his objectives. I doubt if he is clear himself. One step is enough for me, he says ; and he does not try to peep into future or to have a clearly canceived end before him.' Nehru On Gandhi, p. 64.

৩১. Autobiography—p. 551.

৩২. ঐ, পৃঃ ৫৬০।

৩৩. ঐ, পৃঃ ৫৬২।

৩৪. 'I felt angry with him at his religious and sentimental approach to a political question and his frequent references to God in connection with it'. ---Toward Freedom, p. 239.

৩৫. J. N. Nehru—Autobiography, p. 76.

৩৬. A.F, Brockway—The Indian crisis, p. 114.

৩৭. দেবজ্যোতি বর্মণ—নেতাজী সুভাষ, শারদীয়া যুগবাণী, ১৩৬৬, পৃঃ ২৫।

৩৮. Pyarelal—Gandhi-Nehru, A unique Relationship, Link, 30.3.65.

৩৯. Durga Das—India From Curzon To Nehru And After, p. 128.

৪০. গিরিজামোহন সান্যাল—কংগ্রেস-স্মৃতি, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২।

৪১. ড: নরেন ভট্টাচার্য্য--ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ: ১৮৫।

৪২. John Gunther—Inside Asia, p. 463.

৪৩. B. N. Pandey—Nehru, p. 184.

৪৪. Leonard Mosley—The Last Days of The British Raj, p. 81.

৪৫. A Bunch of Old Letters—p 175.

৪৬. B. R, Tomlinson—The Indian National Congress And The Raj, p. 61.

৪৭. ' I felt annoyed with him for choosing a side-issue for the final sacrifice...After so much sacrifice and brave endeavour was our movement to tail off into something insignificant ? '—Nehru on Gandhi, p. 72.

৪৮. 'yes, I admit the prensence of this unknown element and I confess that I myself cannot answer for it nor foretell where it might lead to. Frank Moraes—Jawaharlal Nehru, p 180.

৪৯. D. G. Tendulkar—Mahatma, The Life of Mohandas Gandhi, vol. VIII, p. 351.

৫০ B R. Nanda—Gokhale, Gandhi and the Nehrus, p. 79.

৫১ 'They never tried to judge things on their own, and in any case, they were accustomed to sub-ordinate their judgment to Gandhi.—India wins Freedom, p. 75.

৫২. B. P. Sitaramayya—The History of the Indian National Congress, vol. II, p. 211.

৫৩. C. R. Coupland—Indian Politics, 1936-42, p. 295.

৫৪. S. C. Sarkar—The Need For Rajaji, The Modern Review, July, 72.

৫৫. Ram Manohar Lohia—Guilty Men of the Partition, p.9.

৫৬. Durga Das—Ibid, p. 217.

৫৭ Leonard Mosley—Ibid, p, 108.

৫৮. Alan Campbell-Johnson—Mission with Mountbatten, p. 93.

৫৯ Pyarelal—Mahatma Gandhi, The Last Phase, vol. II p.35

৬০ শৈলেশ দে—গান্ধীজী ও নেতাজী, পৃঃ ৩৩৯।

৬১. Dr. Amarnath Seth—J. P., 110.

৬২. নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী—নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৩।

৬৩. Durga Das—Ibid, pp. 229-30.

৬৪. H. V. Kamath—The Last Days of Jawaharlal Nehru, p. 4.

৬৫. Dr. R. Zakaria—How Powerful Is The Prime Minister ? The Illustrated weekly of India, Jan 30—Feb. 5, 1977.

৬৬ G Austin—The Indian constitution, pp. 140-41,142-143

৬৭. J. C. Johari—Indian Government And Politics, p. 340.

৬৮. Ram Gopal—India China Tibet Triangle, p. 67.

৬৯. এস. কৃষ্ণমূর্তি—চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, অমৃত, ১৬.২.৭৯।

৭০ The Indian Struggle—1920-42, pp. 54-55.

৭১ Dr. B R. Ambedkar—Pakistan, p. 141.

৭২ ডঃ নরেন ভট্টাচার্য—চিত্তরঞ্জন ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, সাপ্তাহিক বসুমতী, ৫.১১.৭০।

৭৩ ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ১৫৯।

৭৪ V. P. S. Raghubanshi—Indian Nationalist Movement And Thought, p. 166.

৭৫ 'To sound the order of retreat just when public enthusiasm was reaching the boiling point was nothing short of national calamity.' The Indian struggle, vol II, p. 108.

৭৬. 'He sounded the order of retreat just when the public enthusiasm had reached the heating point'—Dr. R.C. Majumdar, India's Struggle For Freedom, p. 58.

৭৭ Mahatma Gandhi, p. 152.

৭৮. 'From behind he bars of their prison, Motilal Nehru and Lajpat Rai sent long letters of remonstrance to the Mahatma, which he dismissed with the tactless comment that as prisoners they were civilly dead and were not entitled to expiess an opinion'—Polak, Brailsford and Lawrence -Mahatma Gandhi, p. 153,

৭৯. P. C· Bamford Histories of The Non. coopsration And Khilafat Movements, p. 51.

৮০. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—গান্ধীজী, অমৃত, স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৯৭৮।

৮১ Dr. V. D Mahajan—Indian National Movement And Its Leadrs, pp. 40-41.

৮২. ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী—একুশের অসহযোগ থেকে বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ, আনন্দবাজার, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা ১৩৭৮।

৮৩. Dr. R. C. Majumdar—History of The Freedom Movement In India, Vol 111, pp. 198-99

৮৪ S. Nair—Gandhi And Anarchy, App 111, v

৮৫. K. M. Panikkar—A survey of India, p. 2-7.

৮৬. S. A. Ayar—Unto Him A witness. p. 268.

৮৭ দেবজ্যোতি বর্মন—ঐ, পৃঃ ৩৩।

৮৮. পবিত্রকুমার ঘোষ —ঐ, পৃঃ ৮৬, ৮৯, ৯৮।

৮৯ যোগেশচন্দ্র বাগল—মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃঃ ৩৩৪।

৯০. যেমন বিমলানন্দ শাসমল লিখেছেন—এতে রাজনীতির চমক ছিল বটে, আসলে এসবের কোনো সার্থকতা ছিল না। —অমৃত, স্বাধীনতা সংখ্যা ১৯৭৮।

৯১. শশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল—দেশবন্ধু ও সংবিধান, সাপ্তাহিক বসুমতী, ৫.১১.৭০।

৯২ P. C. Ray—Life And Times of C. R. Das, p. 202.

৯৩. C. Y. Chintamani—Indian Politics Since Mutiny p. 107.

৯৪ R. P. Dutt—India Today, p. 354-55.

৯৫ Pattavi—Ibid, vol. II, p. 268.

৯৬. Important speeches And writings of Subhas Bose (J. S. Bright, (Ed.) pp. 81-82.

৯৭. পুলকেশ দে সরকার—পুরোনো পাতায় সজীব নেতাজী—যুগান্তর, ২৩.১.৬৬।

৯৮. M. K. Gandhi—Hind Swaraj, pp. 48-49.

৯৯. Ibid, pp. 223-24.

১০০. Sankar Ghosh—Political Ideas And Movements In India p. 95.

১০১. Young India, 26. 1. 21.

১০২. M. K. Gandhi—Indian Home Rule, p. 56.

১০৩. 'To-day machinery merely helps a few to ride on the backs of millions. The impetus behind it all is not the philanthrophy to save labour, but greed. It is against this constitution of things that I am fighting with all my might.'— Young India, 13.11.24.

১০৪. Harijan, 2. 11. 34.

১০৫. 'You have, therefore, to be rural-minded before you can be nonviolent and to be rural-minded, you have to have faith in the spinning wheel.' Harijan. 14 11.35

১০৬. নিরঞ্জন হালদার—গান্ধীজীর অর্থনৈতিক ভাবনা, আনন্দবাজার ২.১০.৭৩।

১০৭. Young India, 13.11 24.

১০৮. অম্লান দত্ত—গান্ধীবাদ : আজকে, আনন্দবাজার, ৩০.১.৬৮।

১০৯. Young India, 13.4.31.

১১০ D. G. Tendulkar, Mahatma, vol. 11, p. 374.

১১১. অম্লান দত্ত—গান্ধীবাদ কি অচল ? দেশ, ২০.৪.৬৮।

১১২. Prof. M. Q. sibley in Thought on Gandhi (Khadi & village Industries comm.)

১১৩. J. B. Kripalini—Gandhian Thought, p. 167.

১১৪. কিশোরলাল মশরুওয়ালা – গান্ধী ও মার্কস্, পৃ: ৭৯।

১১৫. 'There may be violence, then again, the land-lords may co-operate. They might co-operate by fleeing.' Lous Fischer—One week with Gandhi, p. 90.

১১৬. N. K. Bose—The Modern Review, oct., 1935.

১১৭ ড: অতীন্দ্রনাথ বসু—নৈরাজ্যবাদ, পৃ: ৩১৪।

১১৮. 'Surely society is largely regulated by the expression of nonviolence in its mutual dealings. What I ask for is an extension of it on a la ger national and international scale' -Harijan, 7.1.39.

১১৯. 'It is better for India to discard violence altogether for defending her borders'.—Harijan, 11. 1. 36.

১২০. 'The idea underlying Satyagraha is to convert the wrong doer, to awaken the sense of justice in him to show him also that without co-operation direct or indirect of the wronged, the worng-doer cannot do the wrong intended by him.'—Harjian, 10. 12. 38.

১২১. B. R. Nanda—Ibid, P. 65.

১২২. Harijan, 13. 4. 40.

১২৩. Harijan, 24. 12. 38.

১২৪. V. T. Patil & G. S. Halappa—Gandhian Politics : A Critical Analysis, The Modern Review, Aug. 73.

১২৫ 'His ideal, so far as a poor mortal may foresee, will ever remain an ideal to be discused in Seminars and papers until God wills otherwise'. Dr.B.R. Sharma—Gandhian Concept of State, P. 150.

১২৬. নির্মল কুমার বসু—বিপ্লবের দুই পন্থা : মার্ক্স্‌বাদ ও গান্ধীবাদ, আনন্দবাজার ২. ১০. ৬৯।

১২৭. Mahadev Desai—Gandhiji In Indian Villages, P. 170.

১২৮. ডাঃ শিশির কুমার বসু—দক্ষিণীবার্তা, নেতাজী জয়ন্তী, ১৯৭৬। পৃ ৩

১২৯. নির্মল বসু—সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিকতা, রাষ্ট্র, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭২।

১৩০. B B. Misra—The Indian Middle classes ; P. 399.

১৩১. The Modern Review, Sept. 1935.

১৩২. শিবব্রত ঘোষ—দেশ, ২৩ ১.৭২।

১৩৩. Meanning of Leftism.

১৩৪. Revolution what Is It (Lokmat Prakasani), P. 3.

১৩৫. Tendulkar, Ibid, vol V, P. 366.

১৩৬ J. S. Bright (Ed), Ibid, P. 198.

১৩৭. An Indian Pilgrim, pp. 65-66.

১৩৮. 'The rejcction of the Resolution is proof of sanity of the congres. The moving of the resolution betrays the impatience—pardona. ble in the circumstance—of some ardant congressmen who have lost all faith in the Britith intention and who think that the British government will never render jnstice to India'—Tendulkar, Ibid, vol. II, P, 239.

১৩৯. 'hastily conceived and thoughtlessly passed'.—A. R : Desai-Social Background of Indian Nationalism , 358.

১৪০. The Indian Struggle, 1920-45, p. 245.

১৪১. Selected Speeches of Subhas Chandra Bose, Ayer (Ed), pp 42-43.

১৪২. A Bunch of Old Letters—p. 74.

১৪৩. The Indian Struggle, vol II, p. 244.

১৪৪. Amrita Bazar Patrika, 2. 1. 30.

১৪৫. Hugh Toye—Ibid, p. 50.

১৪৬. ড: রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস (মুক্তিসংগ্রাম), পৃ: ৩২৭।

১৪৭. H. N. Brailsford—Rebel India, p. 29.

১৪৮. George Rosen—Democraey And Economic Change In India, p. 59.

১৪৯. Louse Fischer– L fe of Gandhi, vol II, pp. 15-16.

১৫০. Desai—Ibid, p. 372.

১৫১. 'By his successive postponments he had given warning that he would not have swaraj at the cost of the sacred principle of Satyagraha'—De, Tripathi & Chandra—Freedom Struggle, p. 139.

১৫২. 'The Working Committe has agreed with me in not making commutation a condition precent to truce. I could therefore only mention it.'—Young India, 2. 4. 31.

১৫৩. Fullness Of Days, p. 149.

১৫৪. Manmathanath Gupta—Bhagat Singh—Crusader for Socialism, in 75th anniversary of Anusilan Samity. p 12.

১৫৫. Pattavi –Ibid, vol I, p. 497 । A Bunch of Old Letters (Nehru), p. 103.

১৫৬. Bertrand Russel-এর ভূমিকা, Delegation Report, p. 103.

১৫৭. Azad—Ibid, p, 16.

১৫৮. 'Gandhiji's plans have all along been revealed to him by his own instinct, not evolved by the cold, calculating logic of the mind. His inner voice is his mentor and monitor his friend philosopher and guide...He saw things as if by a flash and framed his conduct by impulse. To a righteons man, theses two are the supreme guide of life, not reason or intellect'.—Ibid, vol. I, pp. 371, 378.

১৫৯. 'Gandhi was a uuique personality and it was impossible to judge him by the usual standards, or even to apply the ordinary canons of logic to him.'—Nehru on Gandhi, p. 78.

১৬০. Tendulkar—Ibid, vol, II, p. 743

১৬১, ড: অমলেশ ত্রিপাঠি—পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ: ১৫১ ।

১৬২. 'In this, as in many of his other beliefs, Gandhi was wrong. In India, the moral content of British rule could not be reachd by blackmail, for it had become. petrified into a system. In fact, the conscience of the British would have been much more quickly aroused if there were widespread rebellion in India and a consequent attempt to supprees it.'—Michael Edwardes—The Last Years of British India, pp. 47-48.

১৬৩. অরুণচন্দ্র গুহ, নরোত্তম গোপীনাথ সাহা, গল্পভারতী, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৩৮৫।

১৬৪. শৈলেশ দে--পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০।

১৬৫. 'Bhagat Singh was a symbol of the spirit of revolt which has taken possession of the country from one end to the other. That spirit is unconquerble, and the flame which that spirit has lit up will not die. A Beacon Accross Asia. Appendix, p. 2?6.

১৬৬. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় - বিপ্লবীজীবনের স্মৃতি, পৃঃ ৫০।

১৬৭. অনন্ত সিংহ—সুভাষচন্দ্র ও বাংলার বিপ্লবীরা, সাপ্তাহিক বসুমতী, ২৬.১.৬৭।

১৬৮. অমূল্য সেন—সুভাষচন্দ্র, সাপ্তাহিক বসুমতী, ২৭ ১ ৬৬।

১৬৯. 'It is my purpose to set in motion that force as well against the organised violent force of the British rule as the unorganised violent force of the growing party in violence. To sit still would be to give rein to both the forces above mentioned.

১৭০. নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী—নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭।

১৭১. 'Rejecting the epithet of a saint acting as a politician, Gandhi once defined himself as a politician trying to be a saint'. George Woodcock—Gandhi, p. 78.

১৭২. ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২১০। গান্ধীজীর বিবৃতি—Pattavi, Ibid, Vol. I, pp. 579-86.

১৭৩ চপলাকান্ত ভট্টাচার্য—কংগ্রেস-সংগঠনে বাংলা, পৃঃ ২২।

১৭৪. A Bunch of Old Letters—p. 166.

১৭৫. শঙ্করীপ্রসাদ বসু—সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং, পৃঃ ১।

১৭৬ ডঃ শ্রীমন্তকুমার জানা —হরিপুরা, ১৯৩৮—সুভাষচন্দ্র যে ছবি দেখেছিলেন, যুগান্তর, ২৩ ১১.৭৬।

১৭৭. কথাটা নিখুঁত সত্য। Friedman এই ধরণের মন্তব্য করেছেন। An Introduction To World Politics, P. 199.

১৭৮. Dr. Rajendra Prasad—India Divided, p. 371.

১৭৯ Alak Ranjan Basu Chowdhury—Netaji and Twenty Five years of Indian Independence, The Modern Review. August, 1973.

১৮০. Amrita Bazar Patrika, 16.2.39.

১৮১ C. F. Andrews—Views of Mahatma Gandhi, p 285.

১৮২. 'They must regard themselves as trustees holding their wealth for the good of their wards, the ryots. Then, they would take no more than a reasonable amount as commission for their labours.' Young India, 5.12.29.

১৮৩ Maratha, 12.8.34.

১৮৪. 'Subhas Bose differed fundamentally from Gandhiji in vital issues viz, the future course of national movement, industrialisation and Indian attitude towards the British government during the comming world-war. Dr. N. S. Bose The Indian National movement, An outline, p. 93.

১৮৫. শান্তিকুমার ঘোষ—সুভাষচন্দ্রের দেশ গঠন চিন্তা, দক্ষিণীবার্তা, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

১৮৬. V. V. Giri—Netaji Subhas Bose : Some Reminiscences, Amrita Bazar Patrika, 23.1.69.

১৮৭. A. Bunch of old Letters, p. 301.

১৮৮. Dhiresh Bhattacharjee—Understanding India's Economy vol 11, p. 469.

১৮৯. Hindusthan Standard, 8.6.39.

১৯০. A Bunch of Old Letters, p. 388.

১৯১. Madras Mail, 12.12.39.

১৯২. National Front, 16.10.38.

১৯৩. নেপাল মজুমদার—রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ১১৬।

১৯৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮.১১.৩৮।

১৯৫. Krishna Bose—Rabindranath And Subhas Chandra, Amrita Bazar Patrika, 6.5.73.

১৯৬. A Bunch of Old Letters, p. 298.

১৯৭. নেপাল মজুমদার—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১৪৩।

১৯৮. 'Bapuji, bless me for the election.' ড: সত্যনারায়ণ সিংহ —রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র, দেশ, ২৩.১.৭১.

১৯৯. Pattabhi, Ibid, vol. 11. p. 679,

২০০. A. K. Majumdar—Advent of Independence, p. 409.

২০১. ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার—নেতাজী ও জার্মানী, জয়শ্রী, পৌষ, ১৩৮০।

২০২. Crossroads, p. 92.

২০৩. 'If seems that at a later state, sometime in 1938, Congress had tended to towards acceptance of the Federal Part'—Dr. Amiya Chatterjee—The Constitutional Development In India, p. 14

২০৪. কৃষ্ণা বসু—ইতিহাসের সন্ধানে, পৃ: ৬২।

২০৫. Leader, 1.2.39.

২০৬. B. R. Tomlinson—Ibid, pp. 128, 129. 185.

২০৭. Crossroads, p. 106.

২০৮. 'Gandhi, it seems, believed he could convert the fiery revolutionary to his non-violent views. He was wrong... Gandhi now turned the technique of non-cooperation, not aganist the British, but against congress' own President.'—Michael Edwardes—Ibid, p. 67.

২০৯. A Bunch of Old Letters, p. 312.
২১০. Ibid, p. 307.
২১১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ ২.৩৯।
২১২. Durlabh Singh—The Rebel President, p. 129.
২১৩. সত্যরঞ্জন বক্সী, দৈনিক বসুমতী, ২১.১,৬৮।
২১৪. মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—কংগ্রেস : সাংবাদিকের স্মৃতি—আনন্দবাজার, ২৫ ১২.৭২।
২১৫. My strange Illness—The Modern Review, Ap. 1939.
২১৬ Crossroads—p. 113.
২১৭. P. E. Roberts—History of British India, p. 626.
২১৮. Forward, 22 5.28.
২১৯. Azad—Ibid, p 160.
২২০. S. P. Suda—Indian Constitutional Development, p 349.
২২১. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙালি মুসলমান সমাজ, সমতট, নবম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।
২২২, Selected Works of Jawaharlal Nehru S. Gopal (Ed), vol. 9, pp. 480-520.
২২৩. D. K. Roy—Reminiscenses, pp. 110-11.
২২৪. 'I had realised that, at that stage, what ever one's view might be about the way India should develop. Gandhi was India. Anything that weakened Gandhi, weakened India. So I sub-ordinated myself to Gandhi, although I was in agreement with what Bose was trying to do'—Taya Zinkin, Reporting India, p. 217
২২৫. S. P. Cohen—The Indian Army, p. 99
২২৬. 'How can we meet on the political platfrom? Let us agree to differ there and let us meet on the social, moral and municipal platforms. I cannot add the econo. mic, for we have discovered our differences on that platform also.—Crossroads, p. 158.
২২৭, টেলিগ্রাম এবং পত্র-বিনিময় -Crossroads, pp. 126—170.
২২৮. ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৫৭।
২২৯. 'Bose was conciliatory, Gandhi firm in opposition.' Michael Edwardes, p. 126.
২৩০. নেপাল মজুমদার—ঐ, পৃঃ ১৭২।
২৩১. 'To try to push him out seems to me to be an extremely wrong step.'—A Bunch of Old Letters, p. .80.

২৩২. Why I Resigned - Selected Spceehes of Subhas Chandra Bose, S. A. Ayer (Ed.) pp 105-06.

২৩৩. দক্ষিণারঞ্জন বসু—আমার দেখা, আমার জানা সুভাষচন্দ্র, নেতাজী স্মারক গ্রন্থ, বেলডাঙ্গা, ১৯৭৯।

২৩৪. 'Bose was markedly conciliatory and he relied heavily on Nehru's advice. But Gandhi seemed determined to oust him. Bose explored all avenues of conciliation, But the Mahatma was adament. Hence the Bengali leader resigned '—Michael Brecher – Nehru : A Political Biography. p. 101.

২৩৫. 'Gandhi, whom so many both in India and abroad belived to be compounded only of sweetness and light, had, by the use of his overwhelming prestige and the sort of intrigue one would expect from Tammay Hall, succeeded in disposing of the only really opposition to his leadership. – Michael Edwardes, Ibid, p. 67.

২৩৬. 'It was extremely one of the few occasions, when the great men, so cool and collected in his dignity seemed small and peevish.' H. N. Mukharjee—The Gentle Collossus, p. 78.

২৩৭. Hugh Toye—Ibid, p. 59.

২৩৮. Dr. Appadorai—Indian Political Thinking--p 156

২৩৯. 'The 'new class', the Establishment of to day has turned its back on most of Gandhi's cherished ideals.' Frank Moraes--India To day. p 92

২৪০. Hugh Tinker—India And Pakistan, p. 93.

২৪১. শশাঙ্ক শেখর সান্যাল—স্বপ্নের কলকাতা, বেতারজগৎ, ১ ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

২৪২. ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—ঐ, পৃঃ ২২১।

২৪৩. 'Bose's letter gives an admirable enunciation of the true democratic spirit to which it is difficult to advance any theoretical objection.' Dr. R. C. Majumdar—Ibid, Vol III p. 590.

২৪৪. ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—মহাত্মা গান্ধী, পৃঃ ২২৭। Tendulkar, Ibid, [vol. V, p. 56

২৪৫, মণি বাগচি—দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ৮৪।

২৪৬. An Autobiography, p. 606.

২৪৭. Forword Bloc, 19. 8 39.

২৪৮. প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৬।

২৪৯. H. N. Mukharjee—India's Struggle for Freedom, p. 209.
২৫০. প্রভাত মুখোপাধ্যায়—ভারতে জাতীয় আন্দোলন, পৃঃ ২১৪।
২৫১ Harijan, 9 9. 39.
২৫২. 'We do not approach the problem with a view to taking advantage of Britain's difficulties. In a conflict between democracy and freedom on the one side and Fascism and aggression on the other, our sympathy must inevitably lie on the side of democracy,'—Dr. R. C. Majumdar—Ibid, Vol III, p. 597.
২৫৩. Azad—Ibid, p. 31.
২৫৪. Eve Curi—Journey Among Warriors, p. 444.
২৫৫. 'Danger Ahead', Forward Bloc, 6. 1. 40.
২৫৬. 'No, it is time to call a spade a spade and to tell our people clearly that the idea of winning swaraj through spinning is moonshine. Spinning has its place in our national economy, but let it not be exated into the method of our national struggle Ibid, P. 243.
২৫৭. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), দৈনিক বসুমতী, ২৮.১১.৬৫।
২৫৮ B. Mitra & P. Chakravarty—Rebel India, pp, 232-233
২৫৯ ডঃ শ্রীমন্তকুমার জানা —নেতাজী ও ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম, যুগান্তর, ২৩ ১ ৬৯।
২৬০. হেমন্তকুমার বসু—নেতাজীর বৈপ্লবিক মতবাদ—বসুমতী, ২৩.১ ৬৮।
২৬১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—উদ্যত খড়্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৫।
২৬২. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব, পৃঃ ৪৭৭।
২৬৩. Probably no man in his life-time has ever commanded the affectionate reverence of so many millious of his fellowmen.'—W. E. S. Holland—The Indian Outlook, P. 66.
২৬৪. Ernest Barker in Mahatma Gandhi: Essays And Recollections (Ed. S. Radhakrishnan), p. 294
২৬৫. Dr. R. C. Majumdar—India's Struggle For Freedom p. 56.
২৬৬. Dr Tara Chand—Histry of The Freedom Movement In India, Vol. II, p. 550.
২৬৭. Ram sharma (Ed.)—Netaji, p. VII.
২৬৮. শিশির দাস—ইতিহাস-পুরুষ সুভাষচন্দ্র, সাপ্তাহিক বসুমতী, ২১.১.৬৯।
২৬৯. On To Delhi, P. 71.
২৭০. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ১১৭।

পরিশিষ্ট

১ বিঠল ভাই-সুভাষ যৌথ-বিবৃতি :

গত তেরো বছরের অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করেছে যে, আমাদের চূড়ান্ত কষ্টস্বীকার এবং প্রতিপক্ষের ন্যূনতম কষ্টের ভিত্তিতে রচিত রাজনৈতিক আন্দোলন কিছুতেই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। এটা আশা করা বৃথা যে, আমাদের লাঞ্ছনার বিনিময়ে বা ভালবাসার প্রচেষ্টায় আমাদের শাসককুলের হৃদয় পরিবর্ত্তন ঘটবে। আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের ব্যাপারে গান্ধীজীর সাম্প্রতিক কার্য্যাবলী প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যর্থতারই স্বীকৃতি। একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট—রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গান্ধীজী সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সেই জন্যই নতুন নীতি এবং কর্মসূচীর ভিত্তিতে কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করার সময় এসেছে। এই পুনর্গঠন সম্পাদন করার ব্যাপারে এবার নেতৃত্ব-বদলও অবশ্য-প্রয়োজন, কারণ গান্ধীজীর জীবনব্যাপী আদর্শের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় নেতৃত্ব আশা করাটা হবে অন্যায়। যদি কংগ্রেসকে সামগ্রিকভাবে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে সেটাই হবে সব চাইতে ভাল। অন্যথায় সমস্ত সংগ্রামী উপাদান নিয়ে কংগ্রেসের ভেতরেই নতুন দল গঠন করতে হবে। অসহযোগ আন্দোলনকে প্রত্যাহার করা যাবে না ঠিকই, কিন্তু অসহযোগের পদ্ধতিকে পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে আরো জঙ্গী আন্দোলনে পরিণত করতে হবে এবং সংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে সর্ব্বস্তরে।

স্বাঃ ভি. জে. প্যাটেল

সুভাষচন্দ্র বসু

অনু : লেখক। ৯. ৫. ৩৩.

২. জবাহরলালের কাছে চিঠি :

কুরহস্ হক্ল্যাণ্ড

বাদ্গাষ্টীন, (অষ্ট্রিয়া)

৪মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পথের শেষে গতকাল সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি। জায়গাটা সুন্দর এবং শান্ত। কর্মের আবর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তুমি যদি ইউরোপে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারতে, আমি সুখী হতাম।

তোমাকে যেসব বলেছি, সেই মত একটা বিবৃতি দেব কিনা, তোমার কাছ থেকে আসার পর থেকে সেই কথাই ভাবছি, দেওয়াই উচিত বলে আমার মনে হয়, তার কারণ আবার আমার কারারুদ্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে; এবং এমন কিছু লোক হয়ত আছে, যারা আমার পরামর্শ কামনা করে। আমার

বিবৃতি যথাসম্ভব ছোট হবে এবং তাতে স্পষ্টভাবে এই কথাই আম বলব যে তোমাকে আমার পূর্ণ সমর্থন দানের সিদ্ধান্তই আমি করেছি।

বর্তমানে যাঁরা অগ্রগণ্য নেতা, তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার কাছেই আমরা এই আশা করতে পারি যে কংগ্রেসকে প্রগতির পথে পরিচালনা করা হবে। তাছাড়া তোমার প্রতিষ্ঠাও অসামান্য, এবং আমার মনে হয় যে মহাত্মা গান্ধীও তোমার কথাকে যতখানি মেনে নেবেন, অন্য আর কারও কথাকেই ততখানি মেনে নেবেন না। আমি খুবই আশা করছি যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জনচিত্তে তোমার প্রতিষ্ঠাকে তুমি পুরোপুরি কাজে লাগাবে। যেটুকু শক্তি সত্যিই তোমার রয়েছে, তার চাইতে কম শক্তিশালী বলে নিজেকে তুমি মনে কর না। তুমি যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পার, এমন মনোভাব গান্ধীজী কখনও অবলম্বন করবেন না।

আমাদের সর্বশেষ আলোচনায় তোমাকে জানিয়েছি, তোমার আশু-কর্তব্য হবে দুটি—(১) দপ্তর গ্রহণকে সর্বতোভাবে বাধাপ্রদান করতে হবে, ও (২) ওয়ার্কিং কমিটির সংগঠনকে প্রশস্ত ও উদার করে তুলতে হবে। তা যদি তুমি করতে পার ত নৈতিক অবনতির হাত থেকে কংগ্রেসকে তুমি বাঁচাবে, দুর্গতি থেকে তাকে উদ্ধার করবে। বড় বড় সমস্যাগুলিকে ভবিষ্যতের জন্যে মুলতুবি রাখা যেতে পারে, নৈতিক অবনতির হাত থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করা আমাদের আশু কর্তব্য।

শুনে আমি অত্যন্তই সুখী হয়েছি যে কংগ্রেসে তুমি একটি বৈদেশিক বিভাগ খুলতে চাও। আমার অভিমতের সঙ্গে এর সম্পূর্ণই মিল রয়েছে।

যাত্রার জন্য তুমি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছ, যাত্রার আগে নিশ্চয়ই টুকিটাকি নানান কাজও তোমার রয়েছে। তাই এই চিঠিকে আর দীর্ঘ করতে চাই না। কামনা করি, নির্বিঘ্নে যেন স্বদেশে ফিরতে পার, এবং যে ক্লান্তিকর কর্মভার তোমাকে তুলে নিতে হবে, তাতে যেন তোমার সহায় হয়। আমাকে যদি লখনউয়ে যেতে দেওয়া হয়, তাহলে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য আমি প্রস্তুত থাকব।

স্নেহানুসক্ত

অনু: চিত্তরঞ্জন ঘোষাল—মৃত্যুঞ্জয়ী সুভাষচন্দ্র সুভাষ।

৩. শরৎচন্দ্র বসুকে-লেখা একটা চিঠি:

প্রেসিডেন্সী জেল

কলকাতা

২৪ ১০. ৪০.

প্রিয় মেজদাদা,

আমি কয়েকদিন আগে আপনার দেরাদুনের ঠিকানায় বিজয়ার প্রণাম পাঠিয়েছিলাম। আপনি ইতিমধ্যেই সেই চিঠি নিশ্চয় পেয়েছেন।

আমি এই কয়দিন যাবৎ মৌলানা আবুল কালামের চিঠি এবং প্রয়াত ভি. জে. প্যাটেলের উইল সম্বন্ধে আবুল কালাম এবং সর্দার প্যাটেলের শ্রদ্ধার ব্যাপারটা ভাবছি।

প্রথমটা সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি, যেটা আমি জানি না। আমি শুধু আমার মতটা জানাচ্ছি। পরবর্ত্তী অধিবেশন নিকটবর্ত্তী বলেই আপনার এখন বঙ্গীয় আইনসভা থেকে পদত্যাগ করা উচিত হবে না। তবে আপনি উপযুক্ত সময়ে পদত্যাগ করতে পারেন। তাতে কংগ্রেসকে তার সর্বোত্তম প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ জানানো হবে।...

এটা অবশ্য সামান্য ব্যাপার, অন্তত তুলনামূলক বিচারে। সেটা সব চাইতে বড় ব্যাপার তা হল আমাদের কংগ্রেস—কোথায় চলেছে? একের পর একে বিখ্যাত ব্যক্তিরা—যাঁরা অনেক কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার করেছেন কংগ্রেস ছেড়ে যাচ্ছেন। এই ক্ষতিপূরণের জন্য অন্য দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করা হয় নি, সেটা করার লক্ষণ দেখাও যাচ্ছে না। নতুন লোক কংগ্রেসে আসছেনও না।

মহাত্মা গান্ধী নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে, এই ক্ষযিষ্ণুতার ফল হবে অশুভ তাই তিনি তাঁর পূর্বেকার অকুণ্ঠ সহযোগিতার নীতি বদলে ফেলে ব্যক্তিগত আইন অমান্যের পথ বেছেছেন। কিন্তু এটা কি লোক-দেখানো ব্যাপার নয়? এটা যেমন সহযোগিতা নয়, তেমনি নয় গণ-সংগ্রামও। এতে কেউ সন্তুষ্ট হবে না, এই নীতি আমাদের কোথাও পৌছে দেবে না। আর এই আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজের কোনো সম্পর্কও নেই। এটা শুধু কিছু লোককে প্রতারিত করবে কারণ তারা মনে করবে, গান্ধীজী সত্যিই কিছু করছেন।...

গান্ধীবাদের শেষ পর্য্যায়টা—যাতে আছে পবিত্রতার আড়ালে শঠতা (প্যাটেলের উইল সংক্রান্ত ব্যাপারে যার নমুনা), গণতন্ত্রের প্রতি আঘাত এবং রাজনৈতিক সমস্যা দূরীকরণের জন্য অদ্ভুত এবং দুর্জ্ঞেয় সমাধান পদ্ধতি হায়দ-রাবাদের মানুষদের প্রতি উপদেশ স্মর্তব্য) ক্রমে মৃত্যুমুখী হয়ে উঠছে। এখন প্রশ্ন উঠবে কোনটা দেশের পক্ষে বেশী ক্ষতিকারক—বৃটীশ আমলাতন্ত্র, নাকি গান্ধীবাদী গোষ্ঠীচক্র? বাস্তববাদ-বর্জিত আদর্শবাদ যার ভিত্তি হল শূন্যগর্ভ ভাবালুতা—তা কোনোদিনই আকাঙ্ক্ষিত ফল দিতে পারে না।

এই প্রতারণার খেলা কাউকেই ঠকাতে পারবে না—জনসাধারণকেও না, সরকারকেও না। কারণ, আমাদের বাদামী রঙের গোষ্ঠীচক্র যতটা মনে করে, পৃথিবীটা ততটা কিন্তু বোকা নয়। আমাদেরকে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই এগোতে হবে। গান্ধীবাদের মুখোসটা খুলে যাবার আর বেশী দেরী নেই।...

আপনার স্নেহসিক্ত

সুভাষ।

অনুঃ লেখক।

৪. শরৎচন্দ্র বসুর কাছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ।

প্রেসিডেন্সী জেল
কলিকাতা
৩১. ১০. ৪০

প্রিয় মেজদাদা,

আপনি নিশ্চয়ই আমার বিজয়ার চিঠি এবং পরের চিঠিটাও পেয়েছেন। আশা করি দেরাদূনের আবহাওয়া আপনার এবং মেজবৌদির পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক হয়েছে।

নিশ্চয়ই আপনি সংবাদপত্রে পড়েছেন যে, আমি কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছি। কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড এই ঘটনা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-লাভ করবে বলেই মনে হয়।

কংগ্রেস-রাজনীতি নিয়ে যতই ভাবি, ততই আমার মনে হয়—ভবিষ্যতে আমাদের আরো সময় এবং প্রাণশক্তি ব্যয় করতে হবে হাই-কম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। স্বরাজ পাওয়ার পর রাষ্ট্র-ক্ষমতা যদি এই সব নীচ, প্রতিশোধপরায়ণ এবং অসাধু ব্যক্তিদের হাতে যায়, দেশের কী অবস্থা হবে বলুন তো ? আমরা যদি এখনই এদের বিরুদ্ধে লড়াই না করি, তাহলে শেষ পর্যন্ত কিন্তু এদের হাতেই ক্ষমতা বর্তাবে। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আরেকটা কারণ হল—জাতীয় পুনর্গঠন সম্বন্ধে এদের কোনো ধারণাই নেই। গান্ধীবাদ দেশকে একটা ডোবায় পরিণত করবে—দেশের পুনর্গঠন যদি গান্ধীবাদী অহিংসা-নীতির ওপর ভিত্তি করে এগোয়, ভারতের ওপর অন্যান্য হানাদার শক্তিগুলোর লোলুপ দৃষ্টি পড়বে। সেইজন্যই হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে এখনই, আর এর জন্য যখন-যেখানে দরকার—অন্য দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হবে।

পেটের কাছে, মলাশয় এবং উপাঙ্গের পাশে একটা ব্যথার জন্য গত সপ্তাহটা ভাল ছিলাম না। এখন অবশ্য ব্যথাটা একটু কম আছে। আমি উডবার্ণ পার্কের ঠিকানায় লিখছি, কারণ আপনারা কবে নাগাদ ফিরবেন, সেটা আমি ঠিক জানি না। প্রণাম নেবেন ॥

আপনার একান্ত স্নেহভাজন
সুভাষ।